Vol- IV | Issue 3 | Rs- 50

বাংলা

বিজ্ঞান কথা

মার্চ ২০২৬

- ভারতে নারী, বিজ্ঞান ও জননীতি
- হল ক্রিয়া (Hall Effect)
- সোঁদাল ওরফে অমলতাস
- লাল ঠেঙ্গির খোঁজে

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলি

হাইপেশিয়া | গ্রেস মারে হপার

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

হাইপেশিয়া ৬
অমিতেশ ব্যানার্জী

গ্রেস মারে হপার: যিনি কম্পিউটারকে মানুষের ভাষা শিখিয়েছিলেন ১০
প্রেরণা গৌর

ভারতে নারী, বিজ্ঞান ও জননীতি: অন্তর্ভুক্তি থেকে প্রভাব ১৪
আরুবা রাইস ও মোহাম্মদ রাইস

একটি আশ্চর্যজনক গুবরে পোকার বৃত্তান্ত ১৬
সৌরভ সোম

হল ক্রিয়া (Hall Effect): আবিষ্কারের সুলুক সন্ধানে ১৯
প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী

সোঁদাল ওরফে অমলতাস ২৩
দীপাঞ্জন ঘোষ

জলচারী লাল ঠেঙ্গির খোঁজে ২৬
অমর কুমার নায়ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের মার্চ মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৮

মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩০

ফাইবার অপটিক্সের জনক

দেরাদুন শহরের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন শিক্ষক সাবেকি ধারণার ভিত্তিতে বলেছিলেন যে আলো সর্বদা সরলরেখায় চলে, পেছনের বেঞ্চে বসে থাকা এক কিশোর ছাত্রের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে আলোকে বাঁকানো সম্ভব নয়। সেই কিশোর ছাত্রটির নাম নরিন্দর সিং কাপানি, যার বুকের ভেতর তখন দাউদাউ করে জ্বলছে প্রচলিত বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করার এক অদম্য জেদ। সেই জেদ আর সাহসের ওপর ভর করে তিনি পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে দুমড়ে মুচড়ে এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন।

1952 সালে পরিচিত মাটি আর প্রিয়জনদের ছেড়ে নরিন্দর পাড়ি দিলেন লন্ডনের কনকনে হাড়হিম করা ঠান্ডার দেশে। ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সের ল্যাবরেটরির অন্ধকার কোণে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি কাটাতে লাগলেন এক অসম্ভবকে সম্ভব করার নেশায়। তার সঙ্গী ছিলেন প্রফেসর হ্যারোল্ড হপকিন্স, কিন্তু মূল লড়াইটা ছিল নরিন্দরের একার—আলোর গতিপথকে নিজের ইশারায় নাচানোর লড়াই। 1954 সালে নেচার জার্নালে যখন তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হলো, তখন গোটা বিজ্ঞান মহল স্তম্ভিত হয়ে দেখল যে হাজার হাজার সরু কাঁচের তন্তুর মধ্য দিয়ে আলো কেবল যাতায়াতই করছে না, বরং এঁকেবেঁকে ছবিও তৈরি করছে। ঠিক এইভাবেই আমরা পেলাম বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার যার নাম 'ফাইবার অপটিক্স', যা আজ আমাদের আধুনিক যোগাযোগের মেরুদণ্ড।

কিন্তু আলোর পথ গিয়ে মিশলো অন্ধকার ষড়যন্ত্রের দিকে, যেখানে প্রতিভার চেয়ে রাজনীতি আর গায়ের চামড়ার রং অনেক বেশি প্রাধান্য পেল। বিশ্বজুড়ে যখন ফাইবার অপটিক্সের জয়জয়কার, তখন এই প্রযুক্তির আসল জনককে ঠেলে দেওয়া হলো বিস্মৃতির অতলে। 2009 সালে ফাইবার অপটিক্সের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন চার্লস কে. কাও, কিন্তু সেই তালিকায় জায়গা হলো না নরিন্দর সিং কাপানির। অথচ চার্লস কাও-এর গবেষণার বহু আগেই নরিন্দর প্রমাণ করেছিলেন যে ফাইবারের মাধ্যমে আলো পাঠানো সম্ভব এবং তিনিই প্রথম এই পথ দেখিয়েছিলেন।

2020 সালে তাঁর মৃত্যুর পরের বছর ভারত সরকার তাকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করেছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বমঞ্চে তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দেওয়া হয়নি। এই গল্প তাই কেবল একজন বিজ্ঞানীর নয়, এটি এমন এক নায়কের আখ্যান যিনি আলোর দিশারী হয়েও নিজে রয়ে গেলেন প্রচারের আড়ালে।

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বিজ্ঞান, নেতৃত্ব এবং ধারাবাহিকতার শক্তি

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সর্বদাই ক্রমবর্ধমান, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কাজ করা অগণিত মনন দ্বারা গঠিত। এই অগ্রগতিতে নারীদের অবদান বিস্তৃত এবং গভীরভাবে বিভিন্ন শাখায় নিহিত—এত বিস্তৃত যে এটি একটি একক সম্পাদকীয়র সীমিত পরিসরে তাকে তুলে ধরা সম্ভব বা ন্যায্য হবে না। তাই, আজকের আলোচনা কয়েকজন বিজ্ঞানীর প্রতিফলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো যাদের কাজ এবং প্রভাব ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে আমার নিজের সম্পৃক্ততাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি এমন পথিকৃতদের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল যাদের ধারণাগুলি সমসাময়িক গবেষণাকে জনকল্যাণকারী প্রয়োগের রূপ দেয়। মেরি কুরি, তেজস্ক্রিয়তার উপর তার যুগান্তকারী কাজের মাধ্যমে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন উভয় ক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির স্থায়ী মান নির্ধারণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাজ করা অ্যাডা লাভলেস, কম্পিউটিং বাস্তবে পরিণত হওয়ার অনেক আগে থেকেই অ্যালগরিদমিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্পষ্ট ধারণাগুলি তৈরি করেছিলেন। ভারতে আবহাওয়াবিদ্যা এবং বায়ুমণ্ডলীয় যন্ত্রের ক্ষেত্রে আনা মনির অবদান জলবায়ু এবং আবহাওয়া গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করেছিল। আণবিক জীববিজ্ঞানে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের কাজ জেনেটিক্স, জৈবপ্রযুক্তি এবং চিকিৎসার ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।

এরা বিশ্বব্যাপী কালজয়ী অবদানের একটি অংশ মাত্র। তাদের কাজ এমন পরিবেশে বৌদ্ধিক অধ্যবসায়ের উদাহরণ দেয় যেখানে প্রায়শই তাদের মূল্যায়ন হয়েছিল অনেক দেরিতে। সেই উত্তরাধিকার বর্তমান প্রজন্মেও অব্যাহত রয়েছে। কৌশলগত গবেষণা, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের মাধ্যমে, আজকের পেশাদাররা টেকসই উৎকর্ষতার মাধ্যমে এই ভিত্তিগুলির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠছেন। প্রতিরক্ষা গবেষণায় ডঃ টেসি থমাস এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রামানিয়ামের মতো ব্যক্তিত্বরা এই ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করে—প্রতীক হিসাবে নয়, বরং অনুশীলনকারী হিসাবে যাদের কাজ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্বের সাথে প্রযুক্তিগত গভীরতাকে একত্রিত করে। একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিদ এবং শিক্ষাবিদ প্রয়াত অধ্যাপক রোহিনী গডবোলের সাথে আমার ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়া একটি সংজ্ঞায়িত অভিজ্ঞতা হিসেবে রয়ে গেছে। তার চিন্তার স্পষ্টতা, বৈজ্ঞানিক সততার প্রতি অঙ্গীকার এবং তরুণ গবেষকদের উৎসাহিত করার প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছে যে কীভাবে বিজ্ঞানে নেতৃত্ব কেবল আবিষ্কারের মাধ্যমেই নয়, বরং নির্দেশনা এবং উদাহরণের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞান যখন ক্রমবর্ধমান জটিল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, উদীয়মান প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং টেকসই উন্নয়ন মোকাবেলা করছে, তখন ব্যাপক, যোগ্যতা-চালিত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অগ্রগতি নির্ভর করে প্রতিভার বিকাশ এবং তাকে সক্ষম করার উপর এবং এমন পরিবেশ বজায় রাখার উপর যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব, পরামর্শ এবং দায়িত্বকে মূল্য দেওয়া হয়।

এই নারী দিবস কেবল বিচ্ছিন্ন উদযাপন নয়। এই ধারাবাহিকতা স্বীকার করা কেবল বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকেই শক্তিশালী করে না, বরং ভবিষ্যত প্রজন্মকে এমন প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী করে যেখানে সুযোগ এবং শ্রেষ্ঠত্ব অবিচ্ছেদ্য।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা

Mar 2026 | Vol. IV | Issue 3

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তি তে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনমুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

এবং

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

বিজ্ঞান সংবাদ

মানব বিবর্তন ও আদিম প্রাণীর দাঁত

কয়েক দশক ধরে, প্রাচীন মানুষের দাঁতের সরু খাঁজগুলিকে ইচ্ছাকৃত আচরণের প্রমাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হত, যেমন কাঠি বা তন্তু দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা, যা প্রায়শই প্রাচীনতম মানুষের অভ্যাস হিসাবে বর্ণনা করা হয়। নতুন গবেষণা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে। *আমেরিকান জার্নাল অফ বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি*-তে প্রকাশিত একটি গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা 27টি জীবন্ত এবং জীবাশ্ম বন্য প্রাইমেট প্রজাতির 500 টিরও বেশি দাঁত পরীক্ষা করে দেখেছেন যে অনুরূপ খাঁজগুলি প্রাকৃতিকভাবে ঘটে, কোনও সরঞ্জাম বা দাঁতের স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োগ ছাড়াই। মাইক্রোস্কোপ, 3D স্ক্যান এবং বিস্তারিত পরিমাপ ব্যবহার করে, তারা প্রায় 4% ব্যক্তির মধ্যে নন-ক্যারিয়াস সার্ভিকাল ক্ষত সনাক্ত করেছেন। কিছু জীবাশ্ম মানুষের মধ্যে দেখা ক্লাসিক "টুথপিক খাঁজ" এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, অন্যগুলি সম্ভবত ফল সমৃদ্ধ অ্যাসিডিক খাবার বা চিবানোর সময় ঘর্ষণ সক্ষম কণার কারণে ঘটেছিল। এই অনুসন্ধানগুলি থেকে বোঝা যায় যে এই ধরনের খাঁজগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে ইচ্ছাকৃত টুথপিকিং নির্দেশ করে না। আশ্চর্যজনকভাবে, গবেষকরা আধুনিক মানুষের মধ্যে প্রচলিত গভীর, কীলক আকৃতির ত্রুটির কোনও প্রমাণ পাননি—যদিও প্রাইমেটদের উপর শক্তিশালী চিবানোর শক্তি এবং কঠোর খাদ্যাভ্যাস অধ্যয়ন করা হয়েছে। এই অনুপস্থিতি দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আধুনিক মানুষের আচরণের সাথে, যেমন জোর করে ব্রাশ করা, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং অ্যাসিডিক পানীয়ের সাথে, অবক্ষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। একসাথে, এই ফলাফলগুলি জীবাশ্মগুলিতে দাঁতের চিহ্ন ব্যাখ্যা করার সময় সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এবং পরামর্শ দেয় যে কিছু সাধারণ মানুষের দাঁতের সমস্যা গভীর বিবর্তনীয় ইতিহাসের পরিবর্তে আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে অনন্যভাবে জড়িত।

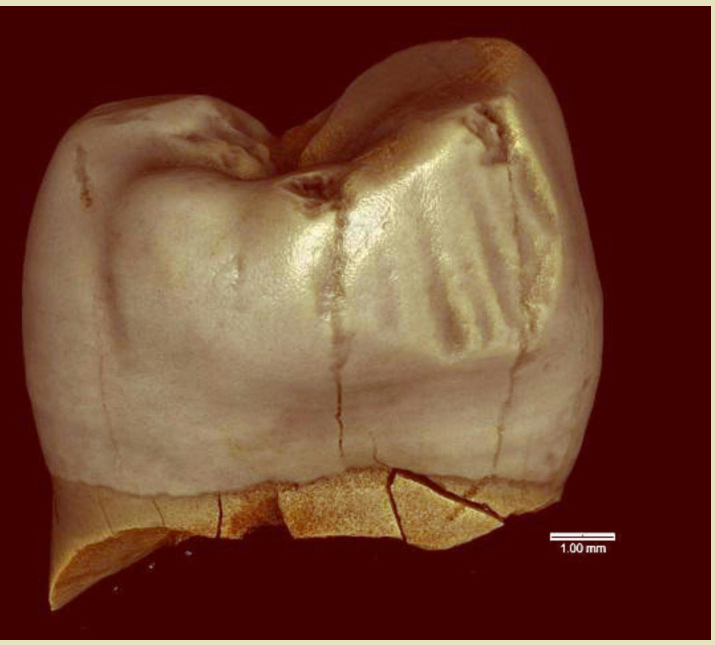

তুষার বানরের উষ্ণ প্রস্রবণ স্নান

জাপানি ম্যাকাক বা তুষার বানর শীতকালে প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের জন্য বিখ্যাত, এই আচরণটি প্রায়শই ঠান্ডার প্রতি সহজ প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যায়। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে এই অভ্যাসের গভীর জৈবিক প্রভাব রয়েছে। জিগোকুদানি স্নো বানর পার্কে দুই শীতকাল ধরে বন্য ম্যাকাকদের অধ্যয়ন করে, গবেষকরা নিয়মিত স্নানকারী স্ত্রী বানরদের সাথে যারা নিয়মিত স্নান করেন না তাদের তুলনা করেছেন। তারা ম্যাকাক হলোবিয়ন্ট—পোষক এবং এর সাথে সম্পর্কিত জীবাণু এবং পরজীবীর উপর প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য আচরণগত পর্যবেক্ষণগুলিকে পরজীবী মূল্যায়ন এবং অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করেছেন। এর ফলাফল সূক্ষ্ম কিন্তু অর্থপূর্ণ পার্থক্য প্রকাশ করেছে। স্নানকারী ম্যাকাকরা তাদের দেহে উকুন বিতরণ করা সংক্রান্ত পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা পরামর্শ দেয় যে উষ্ণ জল পরজীবীর আচরণ বা ডিম পাড়ার ধরণকে ব্যাহত করতে পারে। অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বৈচিত্র্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে একই রকম ছিল, তবে স্নান না করা বানরদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি বেশি ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে স্নান করা বেছে বেছে মাইক্রোবায়াল সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একই জল ব্যবহার করা সত্ত্বেও, স্নান অন্ত্রের পরজীবী সংক্রমণের হার বাড়ায়নি। এই ফলাফলগুলি প্রমাণ করে যে আচরণ হোলোবায়োন্টের সমস্ত উপাদানকে সমানভাবে প্রভাবিত না করেই হোস্ট-পরজীবী এবং হোস্ট-অণুজীবের সম্পর্ক গঠন করতে পারে। গবেষণাটি তুলে ধরে যে প্রাকৃতিক আচরণ কীভাবে প্রাণীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে এবং এই অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করে যে ভাগ করে নেওয়া স্নানের পরিবেশ অগত্যা রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এই গবেষণা বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান এবং মানব স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

ঘূর্ণায়মান ও পুনর্গঠনে সক্ষম স্ফটিক

ঘূর্ণায়মান উপাদান দিয়ে তৈরি স্ফটিক বিষয়টি অবাস্তব লাগতে পারে, কিন্তু নতুন গবেষণা দেখায় যে এগুলি বাস্তব এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। আচেন, ডুসেলডর্ফ, মেইনজ এবং ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা PNAS-এ রিপোর্ট করেছেন যে তথাকথিত ট্রান্সভার্স ইন্টারঅ্যাকশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমগুলি অস্বাভাবিক আচরণের সাথে ঘূর্ণায়মান স্ফটিক তৈরি করতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের মতো প্রচলিত বলের বিপরীতে, ট্রান্সভার্স বলগুলি বস্তুর মধ্যে রেখার সাথে লম্বভাবে কাজ করে, যার ফলে তারা একে অপরের চারপাশে ঘুরতে থাকে। উচ্চ ঘনত্বে, অনেক ইন্টারঅ্যাক্টিং রোটর "অদ্ভুত" উপাদান বৈশিষ্ট্য সহ কঠিন-সদৃশ স্ফটিক তৈরি করে। একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ হল অদ্ভুত স্থিতিস্থাপকতা, আকর্ষণ বলের প্রভাবে প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে এই পদার্থগুলি মোচড় দেয়। এগুলি বাহ্যিক বল ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছোট ঘূর্ণায়মান টুকরোতে ভেঙে যেতে পারে এবং পরে একটি স্ফটিকের মধ্যে পুনরায় একত্রিত হতে পারে। একটি সমন্বিত তাত্ত্বিক কাঠামো এবং কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে বৃহৎ ঘূর্ণায়মান স্ফটিকগুলি বিভক্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, যখন ছোটগুলি কেবল তাদের ঘূর্ণন গতি দ্বারা নির্ধারিত একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত আকারে বৃদ্ধি পায়—যা স্বাভাবিক স্ফটিক বৃদ্ধির বিপরীত ঘটনা। এই তত্ত্বটি এমন গতিশীল ত্রুটিগুলিরও পূর্বাভাস দেয় যার গঠন বাহ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, যার ফলে বস্তুগত বৈশিষ্ট্যগুলি সুরক্ষিত করা যায়। যেহেতু ট্রান্সভার্স মিথস্ক্রিয়া ইঞ্জিনিয়ারড উপকরণ এবং এমনকি জৈবিক সিস্টেমে ঘটে, তাই এই ফলাফলগুলি কোমল পদার্থ পদার্থবিদ্যা থেকে শুরু করে অভিনব যান্ত্রিক বা সুইচিং ডিভাইস পর্যন্ত প্রয়োগগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

সমুদ্র যা কখনো ছিল, এখন নেই

সাম্প্রতিক অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন যে ডাইনোসরদের যুগে মধ্য এশিয়ায় পাহাড়ের নির্মাণের পেছনে সম্ভবত অঞ্চল থেকে অনেক দূরে উৎপন্ন শক্তির প্রভাব ছিল। প্রায় 30 বছরের গবেষণা থেকে পূর্বে প্রকাশিত শত শত তাপীয় ইতিহাসের মডেল সংকলন করে, দলটি বৃহৎ আকারের ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন চিহ্নিত করেছে যা গবেষণাগতভাবে অনন্য। তাদের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে প্রাচীন টেথিস মহাসাগর ক্রিটেসিয়াস যুগে মধ্য এশিয়ার ভূদৃশ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দীর্ঘস্থায়ী অনুমানের বিপরীতে, গবেষকরা দেখেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ম্যান্টেল পরিচলন মধ্য এশিয়ার ভূ-প্রকৃতির উপর সীমিত প্রভাব ফেলেছিল, যা গত 25 কোটি বছর ধরে মূলত শুষ্ক ছিল। পরিবর্তে, পাহাড়ের উত্থানের স্বল্পস্থায়ী পর্বগুলি দূরবর্তী টেথিস মহাসাগরের ধীরে ধীরে লুপ্ত হওয়ার সাথে যুক্ত টেকটোনিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সমুদ্র সৈকতের অববাহিকায় ফিরে যাওয়ার ফলে সম্প্রসারণ সম্ভবত প্রাচীন যুক্ত অঞ্চলগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলে, যা ভবিষ্যতের হিমালয় থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে সমান্তরাল পর্বত শৃঙ্গ তৈরি করে। যদিও আজকের ভূখণ্ডে ভারত-ইউরেশিয়ার সংঘর্ষের প্রভাব রয়েছে, তবুও ডাইনোসররা একই রকম পাহাড়ি ভূখণ্ডে বাস করত। গবেষণাটি বৃহৎ, সমন্বিত ডেটাসেটের শক্তি তুলে ধরে এবং পরামর্শ দেয় যে এই পদ্ধতিটি বিশ্বব্যাপী অন্যান্য দুর্বলভাবে বোঝা যায় এমন অঞ্চলে পর্বত নির্মাণের উৎপত্তি স্পষ্ট করতে পারে।

হাইপেশিয়া

অমিতেশ ব্যানার্জী

বিজ্ঞান ও গণিতের আঙিনা থেকে নারীদের সর্বদাই যেন কিছুটা দূরে থাকার এক অলিখিত নিয়ম তৈরি হয়ে রয়েছে। আজ নয়, সম্ভবত জ্ঞানচর্চার আদি সময় থেকেই। নানারকম প্রথা ও সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা তাদের নানারকম ভাবে নিরুৎসাহিত করেছে বিজ্ঞান ও গণিতের জগতে প্রবেশ করতে। কিছু ব্যতিক্রমী নারী এর মধ্যে থেকেও উঠে এসেছেন এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে জ্ঞানচর্চার ওই দুটি শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই আমরা আজকে আধুনিক কালের বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বা গণিতে ফিল্ডস মেডেল জয়ী মহিলাদের নাম জানি। আবার লীলাবতী বা গার্গীর মত ভারতীয় নারীর কথা জানি যারা এই বাধা উপেক্ষা করে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও গণিতের জগতের নারীদের এক অন্যতম পূর্বসূরী ছিলেন খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতকের এক গ্রীক মহিলা গণিতজ্ঞ ও জ্যোর্তিবিদ হাইপেশিয়া। আমরা আজ তাকে একটু ফিরে দেখার চেষ্টা করবো। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত শিক্ষিকা এবং উপদেষ্টা, দর্শন এবং তিনি বহু ছাত্রকে জ্যোতির্বিদ্যায় শিক্ষাদান করেন। হাইপেশিয়া ডায়োফ্যান্টাসের অ্যারিথমেটিকা এবং অ্যাপোলোনিয়াসের কনিক সেকশনের উপর ভাষ্য লিখেছিলেন এবং সম্ভবত টলেমির আলমাজেস্ট

শিল্পীর কল্পনায় হাইপেশিয়া

সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি সেই সময়কার জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম হাতিয়ার একটি যন্ত্র অ্যাস্ট্রোলেব নির্মাণে সফল হয়েছিলেন, যদিও এটি তার আবিষ্কার ছিল না। মূর্তি পূজায় বিশ্বাসীরা এবং খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি ব্যাপকভাবে সম্মান লাভ করেন। বিশপ সিরিলের সাথে রোমান প্রিফেক্ট ওরেস্টেসের দ্বন্দ্বের সময় তিনি ছিলেন ওরেস্টেসের পরামর্শদাতা। ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন দর্শন, শিক্ষা এবং মহিলাদের বৌদ্ধিক ইতিহাসের স্থায়ী প্রতীক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, 415 খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার মধ্যে হাইপেশিয়া একদল খ্রিস্টান জনতার হাতে নিহত হন।

হাইপেশিয়ার পিতা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার থিওন। থিওন ছিলেন একজন গণিতবিদ, যিনি মাউসিয়ন নামে পরিচিত একটি বিশেষ এবং মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। থিওন নিওপ্লেটোনিজমের একটি রক্ষণশীল রূপ শিক্ষা দিতেন এবং ইয়াম্বলিচাসের ধারণা প্রত্যাখ্যান করতেন। যদিও সমসাময়িক কালে তাকে সম্মান করা হত, আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে তার মূল গাণিতিক কাজকে গৌণ বলে মনে করা হয়। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব ছিল জ্যামিতির অতি বিখ্যাত বই ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এর একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আদর্শ সংস্করণ হয়ে ওঠে। হাইপেশিয়ার মা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। থিওনের বিশেষ স্নেহের পাত্র হিসাবে পরিচিত এপিফানিয়াস তার ভাই কিনা তাও অনিশ্চিত। হাইপেশিয়ার জন্ম সাল নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কিছু পণ্ডিতের মতে হাইপেশিয়ার জন্ম 370 খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু অন্যান্যদের মতে এই সময়কালের স্বপক্ষে প্রমাণগুলি এতটাই দুর্বল যে এই সময়কাল চূড়ান্ত হতে পারে না। এদের মতে তার জন্ম সাল 350 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি।

হাইপেশিয়া ছিলেন গ্রীক পন্ডিত প্লেটোর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত। দার্শনিক কেন্দ্র হিসেবে তখন এথেন্সের পরেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষকতা করে তিনি ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে আসা ছাত্রদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। দামাসিয়াসের মতে, তিনি দার্শনিক হিসাবে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতবাদের উপর জনসাধারণের সমাবেশে বক্তৃতা দিতেন। সেরাপিয়ামের প্রকাশ্য মূর্তি-পূজারী গোষ্ঠীর নব্যপ্লেটোনিজমের বিপরীতে, হাইপেশিয়া একটি মধ্যপন্থী, অ-বিতর্কবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিলেন। নিজে মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তার প্রায় সকল ছাত্রই খ্রিস্টান ছিলেন, যার মধ্যে সাইরেনের সিনেসিয়াসও ছিলেন, যিনি পরে একজন বিশপ হয়েছিলেন। তার চিঠিগুলি হাইপেশিয়ার উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার মতবাদগুলিকে তুলে ধরে। খ্রিস্টান সমসাময়িকরা

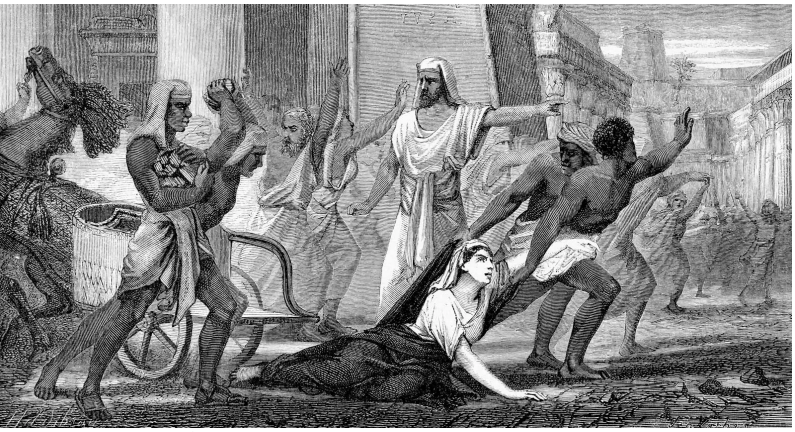

শিল্পীর কল্পনায় জনতার হাতে হাইপেশিয়ার নির্যাতন

হাইপেশিয়ার বুদ্ধিমত্তা এবং চরিত্রের প্রশংসা করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের সক্রেটিস তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তার সময়ের সকল দার্শনিককে ছাড়িয়ে গেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার প্লেটোনিক স্কুলের নেতৃত্ব দিতেন এবং তার কথা শুনতে অনেক দূর দূর থেকে ছাত্ররা সমবেত হতো। ফিলোস্টর্গিয়াস উল্লেখ করেন যে তিনি গণিতে তার পিতাকে ছাড়িয়ে গেছেন, অন্যদিকে হেসিকিয়াস তাকে একজন ব্যতিক্রমী জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে কৃতিত্ব দেন। দামাসিয়াস তাকে সুন্দরী বলে অভিহিত করেন, তিনি আজীবন কুমারী থাকার কথা উল্লেখ করেন এবং একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যেখানে তিনি একজন মোহিত ছাত্রকে জোর করে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার চেয়ে দার্শনিক মননশীলতার প্রতি তার অঙ্গীকারকে নিশ্চিত করে।

382 থেকে 412 সাল পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ থিওফিলাস ইয়াম্বলিচিয়ান নব্যপ্লেটোনিজমের বিরোধিতা করেছিলেন এবং সেরাপিয়াম ধ্বংস করেছিলেন। তবুও হাইপেশিয়ার শিক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল এবং তিনি তাকে একজন মিত্র হিসেবে সমর্থন করতেন। তিনি তার ছাত্র সিনেসিয়াসকে বিশপ হিসেবে সমর্থন করেছিলেন এবং হাইপেশিয়াকে রোমান প্রিফেক্টদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন, যা তার জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। 412 সালে থিওফিলাসের আকস্মিক মৃত্যুর পর একটি সহিংস সংগ্রামের ফলে তার ভাগ্নে সিরিলের উত্থান ঘটে, যিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের শাস্তি দেন এবং হাইপেশিয়ার ছাত্রদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। সিরিলের অধীনে ধর্মীয় সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে, যার মধ্যে রয়েছে সিনাগগ বন্ধ এবং ইহুদি বহিষ্কার। আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান প্রিফেক্ট এবং হাইপেশিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওরেস্টেস বিশপ সিরিলের পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন এবং সম্রাটের কাছে আবেদন করেছিলেন। সিরিলের সমর্থক, প্যারাবালানি, ওরেস্টেসকে আক্রমণ করলে উত্তেজনা সহিংসতায় পরিণত হয়, যা সিরিলের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওরেস্টেস প্রতিশোধ হিসেবে অ্যামোনিয়াসকে মৃত্যুদণ্ড দেন, যিনি সিরিলকে শহীদ ঘোষণা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। দ্বন্দ্ব চলতে থাকলে, ওরেস্টেস হাইপেশিয়ার ব্যাপক শ্রদ্ধা এবং নিরপেক্ষতার কারণে তার পরামর্শ চান। সিরিলের মিত্ররা গুজব ছড়িয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় যে হাইপেশিয়া জাদু অনুশীলন করে। পরবর্তী খ্রিস্টান সূত্রগুলি, বিশেষ করে জন অফ নিকিয়ু, তাকে ওরেস্টেসের উপর শয়তানী প্রভাব বিস্তারের জন্য অভিযুক্ত করে, যা ছিল তাঁর সম্মানের প্রতি চূড়ান্ত আঘাত।

সক্রেটিস স্কলাস্টিকাসের মতে, 415 সালের মার্চ মাসে লেন্টের সময় পিটার নামে একজন বক্তার নেতৃত্বে একদল খ্রিস্টান জনতা আলেকজান্দ্রিয়ায় হাইপেশিয়ার গাড়িতে আক্রমণ করে। তারা তাকে টেনে হিঁচড়ে কাইসারিয়নে নিয়ে যায়, যা একটি প্রাক্তন পৌত্তলিক মন্দির এবং পরে গির্জায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে তারা তাকে অস্ট্রাকা নামক ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে। দামাসিয়াস আরও বলেন যে তার চোখ তুলে ফেলা হয়েছিল। তার দেহ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং স্থানীয় রীতিনীতি অনুসারে যেভাবে অপরাধীদের দেহ টুকরো করে টুকরোগুলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হতো, সেইভাবেই তার খণ্ডিত দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিছু পণ্ডিত যুক্তি দেন যে আক্রমণকারীরা সাধারণ নাগরিক ছিল। সক্রেটিস এই হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত বলে মনে করেছিলেন, যা ওরেস্টেসের সূত্রে হাইপেশিয়া এবং বিশপ সিরিলের মধ্যে উত্তেজনার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তিনি এই হিংস্র আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এই ঘটনাকে অ-খ্রিস্টীয় বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তী তত্ত্বগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিরোধের সাথে তার মৃত্যুকে যুক্ত করার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

হাইপেশিয়ার হত্যা রোমান সাম্রাজ্যকে হতবাক করে দিয়েছিল, কারণ জনসাধারণের অস্থিরতার সময়ও দার্শনিকদের দীর্ঘদিন ধরে নিরাপদ বলে মনে করা হত। জনতার হাতে একজন মহিলা দার্শনিকের হত্যাকাণ্ডকে গভীরভাবে অস্থিতিশীল হিসেবে দেখা হত। যদিও বিশপ সিরিলকে এই অপরাধের সাথে সরাসরি যুক্ত করার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবুও অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন যে হাইপেশিয়ার উপর আক্রমণের পিছনে তার মদত ছিল। তার আচরণে উদ্বিগ্ন হয়ে, আলেকজান্দ্রিয়ান কাউন্সিল

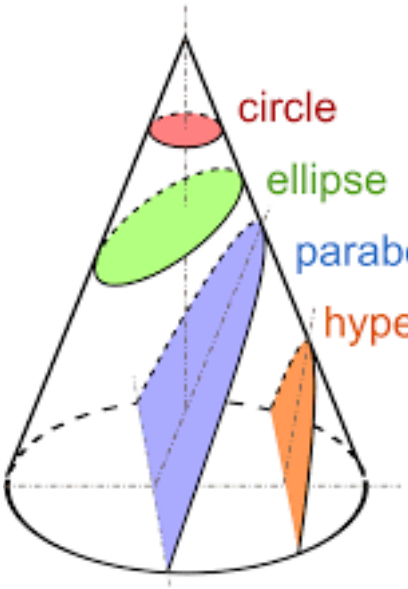

হাইপেশিয়া পার্গার অ্যাপোলোনিয়াসের শঙ্কুছেদের উপর লেখা গ্রন্থের একটি ভাষ্য লিখেছিলেন, কিন্তু এই ভাষ্যটি এখন আর বিদ্যমান নেই।

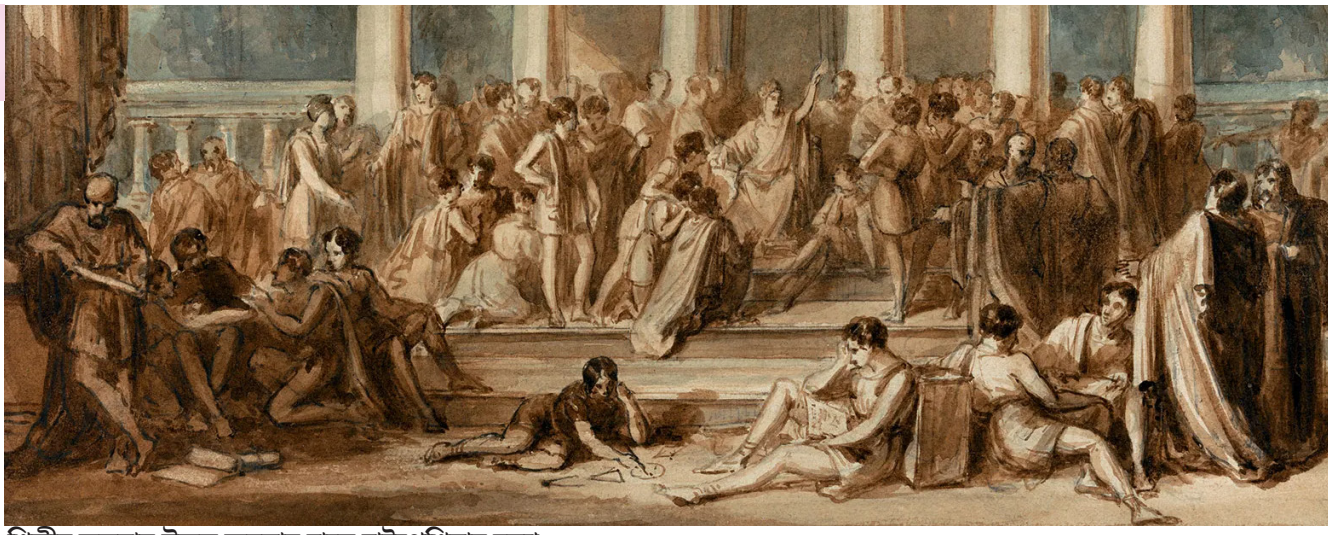

শিল্পীর কল্পনায় উন্মত্ত জনতার হাতে হাইপেশিয়ার হত্যা

কনস্টান্টিনোপলে আবেদন করে, যার ফলে একটি সাম্রাজ্যিক তদন্ত শুরু হয়। 416 সালে, সম্রাট অনারিয়াস এবং দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস প্যারাবালানির ক্ষমতা এবং আকার সীমিত করে এবং তাদের ওরেস্টেসের কর্তৃত্বের অধীনে রাখার জন্য একটি আদেশ জারি করেন। দামাসিয়াস দাবি করেন যে সিরিল ঘুষের মাধ্যমে কঠোর শাস্তি এড়াতে পেরেছিলেন। ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড ওয়াটস যুক্তি দেন যে হাইপেশিয়ার মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ক্ষণকে চিহ্নিত করে, সিরিলের বিরোধিতাকে দুর্বল করে এবং তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম করে।

যদিও প্রায়শই তাকে একজন সর্বজনীন প্রতিভা হিসেবে বর্ণনা করা হয়, সম্ভবত একজন মৌলিক উদ্ভাবকের চেয়ে একজন শিক্ষক এবং ভাষ্যকার হিসাবে হাইপেশিয়ার ভূমিকা বেশি উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বাধীন দার্শনিক রচনা প্রকাশ করেছেন বা বড় গাণিতিক আবিষ্কার করেছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। তার সময়ের অনেক পণ্ডিতের মতো, তিনি ধ্রুপদী গ্রন্থ সংরক্ষণ এবং ব্যাখ্যা করার উপর মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংসের পর, তিনি এবং তার বাবা সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক রচনাগুলি রক্ষা করার জন্য কাজ করেছিলেন। যদিও সুদা দাবি করেন যে তার লেখাগুলি হারিয়ে গেছে, আধুনিক পণ্ডিতরা কিছু টিকে থাকা অবদান চিহ্নিত করেছেন। হাইপেশিয়া গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন এবং এমন এক সময়ে কাজ করেছিলেন যখন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। তিনি টলেমির আলমাজেস্টের তৃতীয় বই সম্পাদনা করার জন্য, জ্যোতির্বিদ্যার গণনার পদ্ধতি উন্নত করার জন্য পরিচিত। কিছু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে তিনি পুরো কাজের বেশিরভাগ অংশ সম্পাদনা করেছেন।

হাইপেশিয়া ডায়োফ্যান্টাসের তেরো খণ্ডের অ্যারিথমেটিকার উপর একটি ভাষ্য লিখেছিলেন, যেখানে একশোটিরও বেশি বীজগণিতীয় সমস্যা উপস্থাপন করা হয়েছিল। যদিও দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হচ্ছিল যে এটি হারিয়ে গেছে, এর কিছু অংশ সম্ভবত 860 সালের দিকে আরবিতে অনুবাদ হয় যার বেশ কিছু অংশ এখনো টিকে আছে। এর মধ্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং অতিরিক্ত সমস্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অ্যালান ক্যামেরনের মতো পণ্ডিতরা যুক্তি দেন যে এই উপাদানটি সম্ভবত হাইপেশিয়ার নিজস্ব কাজ, যা পল ট্যানারি প্রথমে প্রস্তাব করেছিলেন। স্যার থমাস হিথের মতে এই বেঁচে থাকা পাঠ্যটি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত একটি স্কুল সংস্করণকে প্রতিফলিত করে। উইলবার নর এই ব্যাখ্যাকে ভুল বলে মনে করলেও ক্যামেরন হাইপেশিয়ার ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন। হাইপেশিয়া অ্যাপোলোনিয়াসের শঙ্কুচ্ছেদ সংক্রান্ত কাজের উপর ভাষ্যও লিখেছিলেন এবং "অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্যানন" রচনা করেছিলেন। জটিল গাণিতিক পাঠ্য সম্পাদনা করার তার ক্ষমতা দেখায় যে তিনি তার সময়ের শীর্ষস্থানীয় গণিতবিদদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সাইনেসিয়াস লিখেছেন যে হাইপেশিয়া তাকে একটি রূপালী সমতল অ্যাস্ট্রোলেব তৈরি করতে শিখিয়েছিলেন, যা সময় এবং মহাকাশীয় অবস্থান গণনা করার জন্য ব্যবহৃত একটি বহনযোগ্য যন্ত্র। যদিও পরবর্তীকালে কিছু লেখক দাবি করেছিলেন যে তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন, সমতল অ্যাস্ট্রোলেবগুলি শতাব্দী ধরে বিদ্যমান ছিল। তিনি সম্ভবত তার বাবা থিওনের কাছ থেকে এই কৌশলটি শিখেছিলেন, যিনি অ্যাস্ট্রোলেবের উপর গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। সাইনেসিয়াসের চিঠিগুলি দেখায় যে হাইপেশিয়া একজন আবিষ্কারকের চেয়ে প্রধানত একজন পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। অন্য একটি চিঠিতে, তিনি তাকে একটি হাইড্রোস্কোপ তৈরি করতে বলেছিলেন, যা এখন হাইড্রোমিটার নামে পরিচিত, কিন্তু প্রমাণ থেকে জানা যায় যে এটি তার আবিষ্কার ছিল না। আধুনিক প্রমান সত্ত্বেও যে তাকে অনেক আবিষ্কারের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়, বেশিরভাগ পণ্ডিত যুক্তি দেন যে এই ঘটনাগুলির সমর্থনে দৃঢ় প্রমাণের অভাব রয়েছে। বুথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে উদ্ভাবক হিসাবে হাইপেশিয়ার খ্যাতি মূলত টিকে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং পরবর্তীকালের কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে।

হাইপেশিয়ার মৃত্যুর অনেক পরেও আলেকজান্দ্রিয়ায় নব্যপ্লেটোনিজম এবং পৌত্তলিক দর্শন অব্যাহত ছিল, হিয়েরোক্লিস, ফিলোপোনাস এবং অলিম্পিওডোরাসের মতো

পরবর্তী চিন্তাবিদরা প্রভাবশালী রচনা শিক্ষা এবং লেখালেখি করেছিলেন। অন্যান্য মহিলা দার্শনিকরাও তাকে অনুসরণ করেছিলেন। তবে, ওয়াটসের মতে, হাইপেশিয়া কোনও উত্তরসূরি রাখেননি এবং তার আকস্মিক মৃত্যু তার বৌদ্ধিক উত্তরাধিকারকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তিনি নব্যপ্লেটোনিজম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আশা করেছিলেন, কিন্তু তার হত্যা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তী অনেক দার্শনিক তাকে খ্রিস্টান নেতাদের দর্শনের প্রতি বিদ্বেষী হিসেবে দেখতে শুরু করেন এবং হাইপেশিয়া শিক্ষার জন্য শহীদের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তার মৃত্যু দার্শনিকদের মধ্যে আরও শক্তিশালী পৌত্তলিক পরিচয়কে উৎসাহিত করে। দামাসিয়াস ঈর্ষার কথা উল্লেখ করে বিশপ সিরিলকে তার হত্যার জন্য দায়ী করেছিলেন, যদিও তিনি হাইপেশিয়ার সমালোচনাও করেছিলেন, তাকে তার নিজের শিক্ষক ইসিডোরের চেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন।

হাইপেশিয়ার মৃত্যু আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্ববর্তী খ্রিস্টান শহীদদের মতো ছিল, যাদের নির্যাতনের সময় রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার আজীবন কুমারীত্ব এবং দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদেরকে শহীদ ঐতিহ্যের সাথে তার গল্পকে যুক্ত করতে পরিচালিত করে। মধ্যযুগে, তার জীবন আলেকজান্দ্রিয়ার একজন শিক্ষিত কুমারী শহীদ সেন্ট ক্যাথরিনের কিংবদন্তির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে, ক্যাথরিনের ধর্মাবলম্বী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছু অঞ্চলে হাইপেশিয়াকে তার সাথেও চিহ্নিত করা হয়। বাইজেন্টাইন সুডায় হাইপেশিয়ার জীবনের পরস্পরবিরোধী বিবরণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি ভুল দাবি রয়েছে যে তিনি বিবাহিত ছিলেন। পণ্ডিতরা মনে করেন যে এটি গ্রীক পরিভাষার ভুল বোঝাবুঝির কারণে উদ্ভূত হয়েছিল। পরবর্তী লেখকরা যেমন ফোটিওস তার পণ্ডিতিপূর্ণ খ্যাতির উপর জোর দিয়েছিলেন, ইউডোকিয়া মাক্রেম্বোলিটিসাকে "দ্বিতীয় হাইপেশিয়া" হিসাবে প্রশংসা করা তার স্থায়ী প্রভাব প্রদর্শন করে।

ভলতেয়ার পরবর্তীকালে হাইপেশিয়াকে খ্রিস্টীয় ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে একজন যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তার প্রতিভা হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করার জন্য তার গল্প ব্যবহার করেছিলেন। বহু লেখক হাইপেশিয়ার মৃত্যুকে ধর্মীয় কারণে বলে দেখানোর চেষ্টা করেন, যদিও এর বিপরীত মতবাদও যথেষ্ট প্রচার পেয়েছিলো। তার জীবন নিয়ে পরবর্তীতে বহু উপন্যাস, নাটক রচিত হয়। তথ্যগতভাবে এগুলি যথেষ্ট সঠিক ছিল না, বরং এগুলির মধ্যে কল্পনার প্রভাব ছিল অনেক বেশি। 1908 সালে এলবার্ট হাবার্ড হাইপেশিয়ার একটি কাল্পনিক জীবনী প্রকাশ করেন, যেখানে তার জীবন, শিক্ষা এবং বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। ভুল তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার লেখা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং হাইপেশিয়ার আধুনিক ভাবমূর্তি গঠনে সহায়তা করে। প্রায় একই সময়ে, নারীবাদীরা হাইপেশিয়াকে নারীর বৌদ্ধিক সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন। কার্লো পাস্কাল এবং ডোরা রাসেলের মতো লেখকরা তার হত্যাকাণ্ডকে নারীর অগ্রগতির উপর আক্রমণ হিসেবে চিত্রিত করেন। কিছু ঐতিহাসিক পরে দাবি করেন যে তার মৃত্যু ধ্রুপদী শিক্ষার সমাপ্তি, যদিও অন্যরা দ্বিমত পোষণ করেন। কার্ল সাগানের কসমসের মতো জনপ্রিয় রচনা সহ

হাইপেশিয়া সমতল অ্যাস্ট্রোলেব তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়

বিংশ শতাব্দীতেও ভুল ধারণা অব্যাহত ছিল। হাইপেশিয়া ক্রমে আধুনিক নারীদের জন্য একজন আদর্শ হয়ে ওঠেন, নারীবাদী জার্নাল, সংগঠন এবং শিল্পকর্ম তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি একজন শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছেন, যদিও তার জীবনের অনেক জনপ্রিয় চিত্রায়ন ঐতিহাসিকভাবে ভুল। পরে একটি গ্রহাণু এবং চাঁদের একটি গহ্বর নামকরণের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করা হয়েছিল।

হাইপেশিয়া এখনও অনেক দেশে আধুনিক কল্পকাহিনী এবং নন-ফিকশন জগতে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। 2015 সালে বহির্গ্রহ আইওটা ড্রাকোনিস বি তার নামে নামকরণ করা হয়েছিল। উম্বার্তো ইকো, শার্লট ক্র্যামার, কি লংফেলো, ইউসুফ জিদান এবং অন্যান্যদের উপন্যাসে হাইপেশিয়ার উপস্থিতি প্রায়শই উজ্জ্বল বা বীরত্বপূর্ণ চরিত্রে চিত্রিত। সময়-ভ্রমণের গল্প এবং টেলিভিশনের পর্দায়ও তার চরিত্র উঠে এসেছে, যার মধ্যে অন্যতম দ্য গুড প্লেস। 2009 সালে রাচেল ওয়েইজ অভিনীত আগোরা চলচ্চিত্রটি হাইপেশিয়া সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল যদিও এর মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ভুল রয়েছে। তার বৈজ্ঞানিক অর্জনকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছবিটি হাইপেশিয়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। মার্গারেট অ্যাটউডের 2023 সালের সংগ্রহ সহ সাম্প্রতিক কাজগুলি তার জীবনকে পুনর্ব্যাখ্যা করে চলেছে। এই চিত্রায়নগুলি দেখায় যে কীভাবে হাইপেশিয়া একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসাবে রয়ে গেছেন।

*লেখক **শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী** এই পত্রিকার সাথে যুক্ত একজন লোকবিজ্ঞান প্রচারক।*
ইমেল: amitesh.shantifoundation@gmail.com

গ্রেস মারে হপার যিনি কম্পিউটারকে মানুষের ভাষা শিখিয়েছিলেন

প্রেরণা গৌর

গ্রেস ব্রিউস্টার মারে হপার (1906–1992) কম্পিউটার প্রযুক্তির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম। তার খ্যাতির কারণ তিনি দ্রুততম মেশিন ডিজাইন করেছেন বা সবচেয়ে বিমূর্ত সমীকরণ তৈরি করেছেন বলে নয়, বরং তিনি মানুষের সাথে কম্পিউটারের যোগাযোগের পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে রূপান্তরিত করেছেন বলে। আমাদের জানা আছে যে আমরা যে ভাবে কথা বলি বা যেভাবে ভাষার মাধ্যমে আমাদের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান করি কম্পিউটার ঠিক সেভাবে সেটা করে না, তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরণের ভাষা। শিক্ষা সূত্রে একজন গণিতবিদ, চাকরির সূত্রে একজন নৌ কর্মকর্তা এবং মননশীলতার দিক থেকে দূরদর্শী হপার কম্পিউটারকে একটি রহস্যময়, যন্ত্র-আবদ্ধ কার্যকলাপ থেকে মানব-কেন্দ্রিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করেছেন। কম্পিউটারকে মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত—তার এই দৃঢ় মনোভাব আধুনিক সফ্টওয়্যারের দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করেছে।

1906 সালের 9 ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণকারী হপার এমন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠেন যা তার সময়ের প্রচলিত রীতিনীতিকে নীরবে চ্যালেঞ্জ জানায়। তার পিতা, যিনি ছিলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে কন্যারা ছেলেদের মতো একই শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার যোগ্য—বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী মনোভাব। এইরকম পারিবারিক আবহাওয়ায় বৌদ্ধিক কৌতূহল কেবল উৎসাহিতই হয় নি, বরং প্রত্যাশিতও ছিল। ছোটবেলায় গ্রেস অ্যালার্ম ঘড়ির ভেতরের কার্যকারিতা বোঝার জন্য সেটিকে ভেঙে ফেলেছিলেন, এবং তার মা এই ঘটনা জানতে পারার আগেই এটিকে সাতটি অংশে আলাদা করে ফেলেছিলেন। কোনো ঘটনাকে সরাসরি গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রশ্ন করার এই প্রবৃত্তিই ছিল তার বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচায়ক।

তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় মেধা এবং অধ্যবসায় উভয়ই প্রতিফলিত হয়েছিল। নিউ জার্সিতে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি ভাসার কলেজে ভর্তি হন এবং 1928 সালে গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1930 সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং 1934 সালে বিখ্যাত গণিতবিদ অইস্টাইন ওরের তত্ত্বাবধানে গণিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার ডক্টরেট থিসিস, "নতুন প্রকারের অপ্রতিরোধ্যতার মানদণ্ড" তাকে গাণিতিক গবেষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। হপার ভাসারে একজন অনুষদ সদস্য হিসেবে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি গণিত শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তার জন্য শিক্ষকতা ছিল তার আজীবন পেশা।

আজকের ডিজিটাল অর্থনীতিতে COBOL কেন এখনও গুরুত্বপূর্ণ?

ছয় দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও, COBOL (Common Business-Oriented Language) বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল অর্থনীতির একটি নীরব মেরুদণ্ড হিসেবে রয়ে গেছে। গ্রেস মারে হপারের নেতৃত্বে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে ডিজাইন করা COBOL স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং বৃহৎ আকারের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল—এটি এমন গুণাবলী সম্পন্ন যা আজও মিশন-সংকটমূলক সিস্টেমগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে।

COBOL প্রোগ্রামগুলি এখনও বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং, বীমা, সরকারি অর্থ, সামাজিক নিরাপত্তা, বিমান সংস্থা সংরক্ষণ এবং কর ব্যবস্থায় মূল কার্যক্রম পরিচালনা করে। দৈনিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ট্রিলিয়ন ডলার COBOL-ভিত্তিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে, বিশেষ করে লিগ্যাসি মেইনফ্রেম পরিবেশে যা দ্রুত পরিবর্তনের চেয়ে নির্ভুলতা, স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়।

ইংরেজির মতো সহজ পঠনযোগ্য কোডের উপর হপারের জোর ভবিষ্যতের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল। কয়েক দশক আগে লেখা COBOL প্রোগ্রামগুলি এখনও বোঝা, নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে—নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলিতে একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যেখানে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। AI এবং অটোমেশনের যুগে এই মানব-পঠনযোগ্যতা একটি বিশাল কৌশলগত সুবিধা।

আধুনিক ডিজিটাল রূপান্তর COBOL কে প্রতিস্থাপন করে না; বরং এটি এর আবহে কাজ করে। API, ক্লাউড পরিষেবা এবং AI-চালিত বিশ্লেষণ ক্রমবর্ধমানভাবে COBOL সিস্টেমের সাথে ইন্টারফেস করে, যা সংস্থাগুলিকে বিশ্বস্ত কোরগুলিকে ব্যাহত না করে আধুনিকীকরণ করতে সম্মতি দেয়। COBOL প্রোগ্রামারদের বিশ্বব্যাপী ঘাটতি ভাষার অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতা এবং অর্থনৈতিক মূল্যকে আরও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে।

COBOL এখনো টিকে আছে কারণ গ্রেস হপার এটিকে একটি অস্থায়ী প্রযুক্তি হিসাবে নয়, বরং মানুষের অভিপ্রায় এবং মেশিন বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে ডিজাইন করেছিলেন। মানক, বিশ্বাস এবং ধারাবাহিকতা দ্বারা পরিচালিত একটি ডিজিটাল অর্থনীতিতে সেই সেতুটির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হপারের গতিপথকে চূড়ান্তভাবে পরিবর্তন করে। পার্ল হারবার আক্রমণের পর তিনি মার্কিন নৌবাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার বয়স, দৈহিক ওজন এবং গণিতের অধ্যাপক হিসেবে তার সামাজিক অবদানের বিচারে প্রাথমিকভাবে তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু তিনি তার

প্রচেষ্টায় অবিচল ছিলেন। অবশেষে 1943 সালে তিনি একটি ছাড় পান এবং মার্কিন নৌ রিজার্ভ (WAVES)-এ কমিশন লাভ করেন। তিনি স্মিথ কলেজের নৌ রিজার্ভ মিডশিপম্যানস স্কুল থেকে তার শ্রেণীতে প্রথম স্নাতক হন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অফ শিপস কম্পিউটেশন প্রজেক্টে যোগদান করেন।

হার্ভার্ডে তিনি হাওয়ার্ড এইচ. আইকেনের নেতৃত্বে আইবিএম অটোমেটিক সিকোয়েন্স নিয়ন্ত্রিত ক্যালকুলেটর—হার্ভার্ড মার্ক আই—নির্মাণকারী দলে যোগ দেন। 1944 সালের শুরুতে তিনি কম্পিউটারের ইতিহাসের প্রথম দিকের কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের একজন হয়ে ওঠেন। তার কাজের মধ্যে ব্যালিস্টিক ট্র্যাজেক্টোরি এবং নৌ প্রকৌশল সমস্যা সহ জটিল যুদ্ধকালীন গণনা জড়িত ছিল। তিনিই প্রথম "এ ম্যানুয়াল অফ অপারেশন ফর দ্য অটোমেটিক সিকোয়েন্স কন্ট্রোল্ড ক্যালকুলেটর" শীর্ষক বিশদ কম্পিউটার ম্যানুয়াল রচনা করেন। এমনকি এই প্রাথমিক পর্যায়েও, হপার মেশিনগুলি পরিচালনা করার মতোই সেগুলির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করার বিষয়েও সমান আগ্রহী ছিলেন।

যুদ্ধের শেষে হপার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন। ভাসারে গণিতের পূর্ণ অধ্যাপকত্বের পরিবর্তে তিনি কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রকে বেছে নেন। তিনি নৌবাহিনীর চুক্তির

অধীনে হার্ভার্ডে একজন গবেষণা ফেলো হিসেবে থেকে যান এবং 1949 সালে একার্ট-মাউচলি কম্পিউটার কর্পোরেশনে যোগদান করেন, যারা বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার UNIVAC I তৈরি করছিল। সেটা ছিল এমন এক সময়ে যখন কম্পিউটিং পরীক্ষামূলক মেশিন থেকে শিল্প ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। হপার সেখানেই তার বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্য খুঁজে পান।

এখানেই তিনি তার সবচেয়ে মৌলিক ধারণাটি প্রকাশ করেছিলেন, যা ছিল মেশিন-নিরপেক্ষ প্রোগ্রামিং ভাষা। হপার বিশ্বাস করতেন যে কম্পিউটারের জন্য মানুষের বাইনারি বা প্রতীকী কোডে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, মেশিনগুলির উচিত মানুষের পাঠযোগ্য নির্দেশাবলীকে এক্সিকিউটেবল অপারেশনে অনুবাদ করা। 1952 সালে তিনি A-0 সিস্টেম সম্পন্ন করেন—যা প্রথমে একটি কম্পাইলার নামে পরিচিত ছিল এবং পরে একটি লিঙ্কার হিসাবে বর্ণনা করা হয়—প্রতীকী নির্দেশাবলীকে মেশিন কোডে রূপান্তর করার জন্য এটাই ছিল প্রথম কার্যকরী ব্যবস্থা। এই পদক্ষেপই আধুনিক কম্পাইলারের জন্ম এবং মৌলিকভাবে সফ্টওয়্যার বিকাশকে পরিবর্তিত করে।

ক্রমে তার দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হয়। প্রোগ্রামিংকে গণিতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে এই ধারণাটি হপার খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি পরে বুঝেছিলেন, "খুব কম লোকই আসলে প্রতীক ম্যানিপুলেটর। প্রতীক ব্যবহার করার চেয়ে ইংরেজি বিবৃতি লেখা বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে অনেক সহজ।" এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, তিনি FLOW-MATIC-এর উন্নয়নের নেতৃত্ব দেন, যা ছিল ইংরেজির মতো কমান্ড ব্যবহার করে প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা। 1954 সালে তিনি কোম্পানির স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামিংয়ের প্রথম পরিচালক হিসাবে কিছু প্রাচীনতম কম্পাইলার-ভিত্তিক ভাষার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেন।

এই কাজের ফলশ্রুতি হিসাবে কম্পিউটিং ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী উন্নয়নগুলির মধ্যে অন্যতম হল COBOL (Common Business-Oriented Language)। 1959 সালে হপার CODASYL কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হন। এই কমিটি ব্যবসায়িক তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি প্রমিত, মেশিন-নিরপেক্ষ ভাষা তৈরি করেছিল। COBOL হপারের মূল বিশ্বাসকে মূর্ত করে তুলেছিল যে, প্রোগ্রামগুলি মানুষের দ্বারা পাঠযোগ্য হওয়া উচিত। এর প্রভাব ছিল গভীর। 1970 এর দশকের মধ্যে COBOL সরকারী এবং বাণিজ্যিক কম্পিউটিংয়ের জন্য প্রভাবশালী ভাষা হয়ে ওঠে—এবং, উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি আজও ব্যবহৃত হয়।

এই অসামরিক সাফল্য অর্জনের সময়ও হপার মার্কিন নৌবাহিনীর সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিলেন। যদিও 1966 সালে বয়সের নিয়ম অনুসারে তিনি অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন, নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান খণ্ডিত কম্পিউটিং সিস্টেমগুলিকে মানসম্মত করতে সাহায্য করার জন্য তাকে বারবার সক্রিয় দায়িত্বে ডাকা হয়েছিল। 1967 সাল থেকে তিনি প্রোগ্রামিং ভাষার মান, বিতরণকৃত কম্পিউটিং এবং সিস্টেম আন্তঃকার্যক্ষমের জন্য একজন নেতৃস্থানীয় সমর্থক হিসেবে কাজ করেছিলেন। অবশেষে রিয়ার অ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হয়ে তিনি 1986 সালে 79 বছর বয়সে স্থায়ী অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মার্কিন নৌ ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক কমিশন্ড অফিসার।

হপার ছিলেন একজন প্রতিভাবান সঞ্চারক এবং কিংবদন্তি শিক্ষিকা। বরিষ্ঠ সামরিক নেতা থেকে শুরু করে স্কুলছাত্রী পর্যন্ত সকলের উদ্দেশ্যে তিনি নিরলসভাবে বক্তৃতা দিতেন। তার শিক্ষাদানের ধরণ ছিল প্রাণবন্ত এবং অপ্রচলিত। আলোর গতি ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি প্রায় 11.8 ইঞ্চি লম্বা ছোট তারের ছবি ব্যবহার করতেন—যাকে "ন্যানোসেকেন্ড" বলা হত। তিনি তার দেয়ালে একটি ঘড়ি রেখেছিলেন যা পিছনের দিকে ঘুরত। এটি প্রতীকীভাবে স্মরণ করিয়ে দিত যে "মানুষ পরিবর্তনের প্রতি অনীহাযুক্ত।" এই প্রদর্শনগুলি কোনও কৌশল ছিল না; বরং এগুলি ছিল গভীরভাবে বিশ্বাসের প্রকাশ যে, বোধগম্যতা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে।

পরবর্তী জীবনে তিনি বহু স্বীকৃতি লাভ করেন। হপার চল্লিশেরও বেশি সম্মানসূচক ডিগ্রি, 1991 সালে জাতীয় প্রযুক্তি পদক এবং 2016 সালে মরণোত্তর রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা পদক

গ্রেস হপার এবং UNIVAC ও COBOL এর জন্ম

গ্রেস মারে হপার সরকার এবং শিল্পের জন্য প্রাথমিক কম্পিউটারগুলিকে পরীক্ষামূলক মেশিন থেকে ব্যবহারিক সিস্টেমে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। 1949 সালে Eckert-Mauchly Computer Corporation-এ যোগদানের পর তিনি বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার UNIVAC I নির্মাণকারী দলের অংশ হিসাবে কাজ করেন। UNIVAC-এ, হপার প্রচলিত কোডেড মেশিন নির্দেশাবলীর বাইরে গিয়ে কিছু করার প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা আধুনিক সফ্টওয়্যার সিস্টেমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

তার সবচেয়ে স্থায়ী অবদান ছিল স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামিংয়ের ধারণা—ধারণাটি ছিল যে কম্পিউটার দ্বারা মানুষের পাঠযোগ্য নির্দেশাবলীকে মেশিন কোডে অনুবাদ করতে পারা। 1952 সালে হপার A-0 সিস্টেম তৈরি করেছিলেন, যা বিশ্বের প্রথম কার্যকরী কম্পাইলার হিসাবে প্রতীকী এবং শব্দ-ভিত্তিক কমান্ডগুলিকে এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করতে সক্ষম করে। এই অগ্রগতি সফ্টওয়্যার লেখা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে বদলে দেয়।

এই অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে হপার FLOW-MATIC তৈরির নেতৃত্ব দেন, যা প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা যেখানে সাধারণ ইংরেজির মতো বিবৃতি ব্যবহার করা হয়েছিল। FLOW-MATIC সরাসরি COBOL (Common Business-Oriented Language)-এর নকশাকে প্রভাবিত করেছিল, যা 1959 সালে CODASYL উদ্যোগের অধীনে বিকশিত হয়েছিল, যেখানে হপার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত স্থপতি এবং প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছিলেন।

COBOL প্রোগ্রামগুলিকে মেশিনে পাঠযোগ্য, মানসম্মত এবং পোর্টেবল করে ব্যবসায়িক এবং সরকারী কম্পিউটিংয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। 1970 এর দশকের মধ্যে এটি বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষা হয়ে ওঠে। কম্পিউটারগুলি প্রযুক্তিগত বিমূর্ততার দাবি করার পরিবর্তে মানুষের বোধগম্যতার সেবা করবে—হপারের এই দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠতার সাথে প্রমাণিত হয়।

আজ, কয়েক দশক পরে, COBOL সিস্টেমগুলি এখনও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বব্যাপী পরিকাঠামোকে সমর্থন করে, যা স্পষ্টতা, অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং মেশিন-স্বাধীন প্রোগ্রামিংয়ের উপর গ্রেস হপারের আরোপিত গুরুত্বের স্থায়ী প্রভাবকে প্রতিফলিত করে।

লাভ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান, জাহাজ, সুপার কম্পিউটার এবং এমনকি মাইক্রোআর্কিটেকচার—ইউএসএস হপার থেকে শুরু করে এনভিডিয়ার "হপার" জিপিইউ আর্কিটেকচার—তার নাম বহন করে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব কোনও সংকলক বা ভাষা নয়, বরং মানুষের মননশীলতার বিকাশে তিনি যে কাজ করেছেন সেটাই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তিনি একবার বলেছিলেন, "আমি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছি, তা হল তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ... এবং যখন তারা ঝুঁকি নেয় তখন তাদের সমর্থন করা।"

1992 সালের 1 জানুয়ারী গ্রেস মারে হপারের মৃত্যু হয় এবং আর্লিংটন জাতীয় কবরস্থানে তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। তার উত্তরাধিকার প্রতিটি পাঠযোগ্য কোড, স্পষ্টতার জন্য ডিজাইন করা প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষা এবং প্রযুক্তিকে আরও মানবিক করার প্রতিটি প্রচেষ্টায় ভাস্বর হয়ে আছে।

গ্রেস হপারের প্রতিভা কেবল আবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি কম্পিউটিংয়ের দর্শনকে নতুন রূপ দিয়েছেন। মেশিনগুলিকে মানুষের ভাষা বলতে ও বুঝতে শেখানো এবং ডিজিটাল ভবিষ্যত বোধগম্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভাগ করে নেওয়া নিশ্চিত করার কারণে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ●

অধ্যাপক ডঃ প্রেরণা গৌর *NSUT-এর ওয়েস্ট ক্যাম্পাসের নির্দেশক, IEEE ইন্ডিয়া কাউন্সিলের চেয়ারপারসন, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণের প্রবক্তা। ইমেল: prernagaur@yahoo.com*

ভারতে নারী, বিজ্ঞান এবং জননীতি—অন্তর্ভুক্তি থেকে প্রভাব

আরুবা রইস এবং মোহাম্মদ রইস

ভারত তার উন্নয়ন যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত। মহাকাশ অভিযান এবং ডিজিটাল জন পরিকাঠামো থেকে শুরু করে জৈবপ্রযুক্তি থেকে জলবায়ু প্রযুক্তি পর্যন্ত, জাতি ক্রমবর্ধমানভাবে বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের ভাষায় কথা বলছে। তবুও, এই অনুপ্রেরণামূলক জাতীয় আখ্যানের মধ্যে একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে গেছে: কে বিজ্ঞানে অংশগ্রহণ করতে পারবে—এবং কে এটিকে রূপ দেবে? এটি কেবল প্রতিনিধিত্বের বিষয় নয়। এটি জাতীয় সক্ষমতার বিষয়। একটি দেশে যখন তার প্রতিভার একটি বড় অংশ বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ারে হতে পারে না বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাদ পড়ে তখন সেখানে কখনোই একটি টেকসই উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র তৈরি হতে পারে না। এই অর্থে, নারী, বিজ্ঞান এবং জননীতির মধ্যে সম্পর্ক একটি ঐচ্ছিক সামাজিক বিতর্ক নয়; এটি India@2047 এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এজেন্ডা।

বিজ্ঞান এবং ভারতীয় নারী: একটি অসমাপ্ত যাত্রা

বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীর অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারত দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশের অনেক অংশে মহিলারা এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় STEM শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, বিশেষ করে জীবন বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে, শ্রেণীকক্ষে তাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। তবে এই আশাবাদ স্নাতক স্তরের পরে ম্লান হয়ে যায়। শিক্ষার স্তর বৃদ্ধি এবং ক্যারিয়ার আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠার সাথে সাথে, মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। নেতৃত্বের পদগুলিতে পৌঁছানোর সময় তাদের প্রতিনিধিত্ব লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়।

এই পরিবর্তন কখনোই স্বাভাবিক নয়; বরং এটি কাঠামোগত দুর্বলতা। এটি প্রতিফলিত করে যে প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক ব্যবস্থা কীভাবে সুযোগ এবং বাধা তৈরী করে। সমস্যাটি নারীরা বিজ্ঞান করতে পারে কিনা তা নয়, বরং তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে, নিরাপদে এবং স্বীকৃতির সাথে তা করতে সক্ষম কিনা তা।

কয়েক দশক ধরে, বিজ্ঞানে নারীর অংশগ্রহণ মূলত ক্ষমতায়নের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, বৃত্তি এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এই পদক্ষেপগুলি অপর্যাপ্ত। বিজ্ঞানে নারীদের অংশগ্রহণ অবশ্যই জননীতির অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কারণ বৈজ্ঞানিক সক্ষমতাই জনস্বাস্থ্য, জলবায়ু কর্মকাণ্ড, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে গতিশীল করে।

যখন নারীরা গবেষণার পেশা ছেড়ে দেন, দেশ তখন জনসাধারণের অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিভা হারায়। যখন নেতৃত্ব এবং নীতিনির্ধারণী সংস্থাগুলিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব কম থাকে, তখন গবেষণার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যায় এবং নীতিনির্ধারণ কম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। অতএব, অন্তর্ভুক্তি কেবল ন্যায্যতার বিষয় নয়; এটি ভারতের বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বিষয়।

প্রকৃত সমস্যা STEM–এ প্রবেশ নয়, টিকে থাকা ও অগ্রগতি

আজ ভারতের প্রধান বাধা কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীদের প্রবেশ নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ারে তাদের ধরে রাখা এবং অগ্রগতি। অনেক তরুণী তাদের ডিগ্রি সম্পন্ন করে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় প্রবেশ করে না। অন্যরা গবেষণা ক্যারিয়ার শুরু করে কিন্তু ব্যক্তিগত এবং কাঠামোগত চাপের কারণে বন্ধ করে দেয়। কেউ কেউ সিস্টেমে থেকে যায় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত এবং সুযোগের অসাম্যের কারণে তাদের অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পরে।

ড্রপআউটের কারণগুলি সহজে অনুমানযোগ্য। স্নাতক হওয়ার পরে বিবাহ, অবস্থান, যত্ন এবং "গ্রহণযোগ্য" কাজের পরিবেশ সম্পর্কে পারিবারিক প্রত্যাশা ক্যারিয়ারের পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। পিএইচডি পর্যায়ে, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘায়িত প্রশিক্ষণ স্থিতিশীলতার জন্য সামাজিক চাপের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়। পোস্টডক্টরাল এবং প্রাথমিক ক্যারিয়ারের বছরগুলি হয় সর্বাধিক চাপযুক্ত, যা ধারাবাহিকতাকে কঠিন করে তোলে। এমনকি যারা টিকে

থাকে তারা প্রায়শই অদৃশ্য বাধার মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে নেটওয়ার্কে সীমিত অ্যাক্সেস, কম উচ্চ-মূল্যবান সহযোগিতা, কম নেতৃত্বের সুযোগ এবং দুর্বল পেশাদার দৃশ্যমানতা।

এই নিদর্শনগুলি একটি সহজ সত্য প্রকাশ করে—সমস্যাটি উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব নয়, বরং ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ারকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক ব্যর্থতা। ভারত এই বিষয়টি উপেক্ষা করেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানে নারীদের সহায়তায় একাধিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 সমতা ও অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিয়েছে এবং শিক্ষা সংস্কারে লিঙ্গ-সংবেদনশীলতাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিক্ষা-নীতি পাইপলাইনের মূল—এটি আত্মবিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবেশাধিকার গড়ে তোলে।

বিজ্ঞান বাস্তুতন্ত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (DST) নারী বিজ্ঞানীদের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, বিশেষত পরিচর্যার কারণে বিরতি নেওয়া গবেষকদের পুনঃপ্রবেশের সুযোগ দিয়ে। এসব কর্মসূচি একটি আধুনিক উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করে—গবেষকের জীবনে বিরতি থাকলেই বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে বাতিলযোগ্য ধরা উচিত নয়। মাতৃত্ব বা পরিচর্যার কারণে ক্যারিয়ার-বিরতি অযোগ্যতার প্রমাণ নয়; এটি সামাজিক দায়িত্বের প্রমাণ। নীতি-ব্যবস্থা যখন কলঙ্ক ছাড়াই পুনঃপ্রবেশের সুযোগ দেয়, তখন জাতিই লাভবান হয়।

সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দিকে ভারতের অগ্রসর হওয়া। ব্যক্তিগত সহায়তার বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর উদ্যোগ দর্শনে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়—নারীদের সংশোধনের বদলে তাদের চারপাশের ব্যবস্থাকে সংশোধন করা। এটি অপরিহার্য, কারণ বিজ্ঞানে বৈষম্য সচরাচর প্রকাশ্যে ঘটে না; এটি ঘটে সূক্ষ্ম গেটকিপিংয়ের মাধ্যমে—নিয়োগ কমিটি, ল্যাব-স্পেস বণ্টনের অসমতা, অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক, পক্ষপাতদুষ্ট মূল্যায়ন পদ্ধতি ও অন্তর্ভুক্তিহীন নেতৃত্ব সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে।

এই উদ্যোগ সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ বড়, কারণ সমস্যাটি জটিল। নীতিগতভাবে কিছু দরজা খুলেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ারের কাঠামো এখনো বিরতিহীন ও উচ্চ-গতিসম্পন্ন জীবনধারাকেই পুরস্কৃত করে। ক্যারিয়ার নকশা বদলানো না গেলে সহায়তা কর্মসূচি থেকে আংশিক সহায়তায় পাওয়া সম্ভব।

অবশিষ্ট বাধা: নিরাপত্তা, পরিচর্যা, পক্ষপাত ও দৃশ্যমানতা

ভারতে বিশেষ করে বিজ্ঞানে নারীদের জন্য একটি বড় বাধা হলো ক্যারিয়ার অনুসরণের পরিবেশ। বৈজ্ঞানিক কাজ সবসময় নিরাপদ ও পূর্বানুমেয় স্থানে হয় না। ক্ষেত্রীয় কাজ, ভ্রমণ, সন্ধ্যা পর্যন্ত ল্যাব-সময়সূচি এবং পুরুষ-প্রধান পেশাগত সংস্কৃতি বাস্তব সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। নিরাপত্তা কেবল সামাজিক সমস্যা নয়; এটি অংশগ্রহণের সমস্যা। যেখানে নারীরা নিরাপদ বোধ করেন না, সেখানে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ক্যারিয়ার বিকল্প সীমিত করেন—যেমন কম ভ্রমণপ্রয়োজনীয় শাখা বেছে নেওয়া বা উচ্চতর দৃশ্যমানতা ও চলাচল দাবি করা নেতৃত্ব ভূমিকা এড়িয়ে চলা।

আরেকটি বাধা হলো মাতৃত্ব ও পরিচর্যার সমস্যা। বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ার প্রকাশনা, গবেষণার ধারাবাহিকতা,

সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর নির্ভরশীল। সামান্য বিরতিও প্রতিযোগিতাশক্তি কমিয়ে দিতে পারে। মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্বের বাস্তবতাকে সংস্থা প্রায়ই যথাযথভাবে বিবেচনা করে না। শিশু পরিচর্যা সহায়তা, নমনীয় কাজের কাঠামো ও ন্যায্য মূল্যায়ন না থাকলে সামাজিক দায়িত্বের জন্য নারীদের চড়া পেশাগত মূল্য দিতে হয়।

অনুদান ও স্বীকৃতির বণ্টনেও পক্ষপাত রয়ে গেছে। গবেষণায় অগ্রগতি কেবল দক্ষতার ফল নয়; সুযোগেরও ফল। বড় প্রকল্পের নেতৃত্ব, উচ্চ-প্রভাবের সহযোগিতা ও নেতৃত্বস্তরের অনুদান—এসব নেটওয়ার্ক, পরামর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। নারীরা প্রায়ই এসব সুযোগ কম পান, ফলে তাদের দৃশ্যমানতা কমে এবং পরবর্তীতে নীতি-নির্ধারণ ও উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক বোর্ডে অন্তর্ভুক্তিও সীমিত হয়।

আরেকটি প্রায় উপেক্ষিত দিক আছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় ও গবেষণায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও বিজ্ঞান-নীতি নেতৃত্বে তাদের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে ভারত এখনো সংগ্রাম করছে। এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান নীতিকে প্রভাবিত করে, আর নীতি নির্ধারণ করে কোন বিজ্ঞান অর্থায়ন পাবে, কোন গবেষণা অগ্রাধিকার পাবে, এবং কোন জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

যদি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সংস্থা ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থায় নারীরা অনুপস্থিত থাকেন, তবে তারা জাতীয় ভবিষ্যৎ নির্মাণে অংশগ্রহণকারী হিসাবে নয়—বরং অন্যদের নকশা করা ভবিষ্যতের ভোক্তা হয়ে থাকবেন। ভারতের প্রয়োজন নারীদের শুধু ল্যাবে নয়, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্য যোগাযোগ, জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা, জীবপ্রযুক্তি নৈতিক কাঠামো ও এআই শাসন নকশাকারী কমিটিতেও তারা সমান প্রয়োজনীয়।

দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উন্নয়নের জন্য নারী বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ নীতি-প্রবক্তা হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। তাদের ভূমিকা অংশগ্রহণকারী থেকে প্রভাবক, অবদানকারী থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীতে রূপান্তরিত হতে হবে।

বিজ্ঞান যোগাযোগ: নারীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাগরিকত্ব গড়ার এক শক্তিশালী সুযোগ

কোভিড-19 মহামারি বিশ্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে: বিজ্ঞান তখনই কার্যকর, যখন তার সঞ্চার যথাযথভাবে ঘটে।

১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ...

একটি আশ্চর্যজনক গুবরে পোকার বৃত্তান্ত

সৌরভ সোম

আমরা অনেকেই টিভির পর্দায় নিশ্চয়ই দেখেছি বা ইতিহাসের বইতে পড়েছি যে প্রাচীন কালে শত্রু সৈন্যরা দুর্গ আক্রমণ করলে দুর্গের অধিবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য দুর্গপ্রাকার থেকে ফুটন্ত, ক্ষতিকারক তরল পদার্থ শত্রু সৈন্যের দিকে নিক্ষেপ করতো যার সংস্পর্শে এলে শত্রু সৈন্যরা পুড়ে যেত বা সাংঘাতিকভাবে আহত হত। আত্মরক্ষার এই কৌশল কিন্তু মানুষ প্রথম উদ্ভাবন করে নি। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব হওয়ার বহু আগে থেকে এক ধরনের গুবরে পোকা (beetle), যাদের আমরা গোলন্দাজ বা বোমারু গুবরে পোকা বলে থাকি, এই পদ্ধতিতে আত্মরক্ষা করে থাকে।

গোলন্দাজ বা বোমারু গুবরে পোকা (Bombardier beetle) কোলিওটেরা অর্ডারের (Order: Coleoptera) অন্তর্ভুক্ত পতঙ্গ (insect) শ্রেণীভুক্ত প্রাণী যারা আত্মরক্ষার্থে নিজের দেহে এক ধরনের ক্ষতিকারক ফুটন্ত (boiling) তরল পদার্থ তৈরি করে সেটি দ্রুত শত্রুদের দিকে ছিটিয়ে দেয় অথচ নিজে অক্ষত থাকে।

পতঙ্গরা সন্ধিপদী (Phylum: Arthropoda) পর্বভুক্ত প্রাণী (animal)। পতঙ্গদের উদাহরণ হলো পিঁপড়ে, মশা, মাছি, প্রজাপতি, আরশোলা, ফড়িং, মৌমাছি ইত্যাদি। এদের দেহ কিউটিকল (cuticle) নামক এক ধরনের বহিঃকঙ্কাল (exoskeleton) দিয়ে ঢাকা থাকে যা কাইটিন (chitin) নামক নাইট্রোজেন যুক্ত এক ধরনের জটিল কার্বোহাইড্রেট দিয়ে তৈরি হয় । পতঙ্গদের দেহে মস্তক (head), বক্ষ (thorax) ও উদর (abdomen) এই তিনটি অংশ থাকে এবং দেহের বক্ষদেশে তিন জোড়া সন্ধিল উপাঙ্গ (paired jointed appendages) থাকে। গুবরে পোকাদের (Order: Coleoptera) দেহের বক্ষদেশ থেকে নির্গত হওয়া দুই জোড়া ডানার মধ্যে প্রথম জোড়া শক্ত হয়ে এলিট্রা (elytra) নামক এক ধরনের আবরণ তৈরি করে যা দ্বিতীয় জোড়া ডানা এবং উদরদেশকে ঢেকে রাখে।

গোলন্দাজ বা বোমারু গুবরে পোকা (Bombardier beetle) দৈর্ঘ্যে 1 ইঞ্চির বেশি হয় না । এদের ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এই মহাদেশগুলিতে পাওয়া যায়; ভারতেও এই বোমারু গুবরে পোকার অস্তিত্ব আছে। এরা সাধারণত শুকনো, রৌদ্রজ্জ্বল, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বাস করে। সারা পৃথিবী জুড়ে বোমারু গুবরে পোকার কয়েকশো প্রজাতি আছে যারা আত্মরক্ষার পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত।

কুইনোন (quinone) হলো এক ধরনের জৈব যৌগ যেগুলি থেকে গুবরে পোকারা sclerotin নামক এক ধরনের বাদামী বর্ণের জৈব পদার্থ তৈরি করে । sclerotin ব্যবহার করে গুবরে পোকারা তাদের কিউটিকলকে শক্ত করে। বোমারু গুবরে পোকার উদরদেশের ক্ষরণ গ্রন্থির (secretory gland) কোশে আলাদা আলাদা ভাবে হাইড্রোকুইনোন (hydroquinone), মিথাইলহাইড্রোকুইনোন (methylhydroquinone) এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড (hydrogen peroxide) পদার্থগুলি তৈরি হয়। তৈরি হওয়ার পর এই পদার্থগুলি বোমারু গুবরে পোকার উদর দেশে একটি সঞ্চয়-প্রকোষ্ঠে (reservoir) সঞ্চিত হয় । বোমারু গুবরে পোকাদের উদরদেশে (abdomen) একটি প্রকোষ্ঠ থাকে যার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়; এই প্রকোষ্ঠটিকে রিঅ্যাকশন চেম্বার (reaction chamber) বলে । অন্য কোন প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে বোমারু গুবরে পোকা তার উদরের সঞ্চয়-প্রকোষ্ঠে রাখা পদার্থগুলিকে একটি কপাটিকার (valve) মাধ্যমে উদরস্থিত রিঅ্যাকশন চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়। ঐ রিঅ্যাকশন চেম্বারে পারক্সিডেজ (peroxidase) ও ক্যাটালেজ (catalase) নামক দুটি উৎসেচক (enzyme) থাকে যাদের প্রভাবে খুব দ্রুত হাইড্রোক্সিকুইনোন (অ্যারোমেটিক জৈব যৌগ), মিথাইল হাইড্রোক্সিকুইনোন (অ্যারোমেটিক জৈব যৌগ) ও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের (অজৈব যৌগ) বিক্রিয়া ঘটে ক্ষতিকারক বেঞ্জোকুইনোন (benzoquinone) তৈরি হয়। এই

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপের প্রভাবে রিঅ্যাকশন চেম্বারের মধ্যস্থিত জল বাষ্পে পরিণত হয়। এর ফলে যে বাষ্প চাপ (vapour pressure) তৈরি হয় তার প্রভাবে রিঅ্যাকশন চেম্বার থেকে বেঞ্জোকুইনোন সমন্বিত এই দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতিকারক ফুটন্ত তরল মিশ্রণ দ্রুত একটি একমুখী বহিঃকপাটিকার মাধ্যমে বোমারু গুবরে পোকার উদরদেশের পায়ুছিদ্র (anus) দিয়ে সশব্দে সজোরে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া উত্তপ্ত তরল পদার্থের এই ইচ্ছামতো অভিমুখে দ্রুত নিক্ষেপণ পদ্ধতিকে পালস জেট প্রপালশন (pulse jet propulsion) বলা হয়। ঐ তরল পদার্থ নিক্ষেপ করার সময় বোমারু গুবরে পোকা তার দেহকে শত্রুর দিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং ঐ তরল পদার্থকে শত্রুর দিকে সঠিকভাবে নিক্ষেপ করে। বেঞ্জোকুইনোন আমাদের ত্বক, চোখ ও শ্বসনতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অন্যান্য পতঙ্গরা এই ফুটন্ত ক্ষতিকারক তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে মরে যায়। শত্রুর দিকে এই তরল নিক্ষেপণের সময় শব্দ হয় ও উৎপন্ন বাষ্পের কিছুটা বোমারু গুবরে পোকার দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে তাই দেখে মনে হয় যেন সশব্দে কামানের গোলা ছোড়ার ফলে ধোঁয়া তৈরি হয়েছে।

যখন শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় বোমারু গুবরে পোকা কেবলমাত্র তখনই হাইড্রক্সিকুইনোন এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড সঞ্চয়-প্রকোষ্ঠ থেকে রিঅ্যাকশন চেম্বারে এনে এই বিক্রিয়াটি ঘটায় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন উত্তপ্ত ক্ষতিকারক তরল পদার্থ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ দেহের বাইরে শত্রুর দিকে নিক্ষেপিত হয়; অর্থাৎ এই ক্ষতিকারক উত্তপ্ত তরল পদার্থ বোমারু গুবরে পোকা তার নিজ দেহের মধ্যে কখনোই সঞ্চয় করে রাখে না, কেবলমাত্র রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপাদানগুলিকে সঞ্চয় করে রাখে যাতে আত্মরক্ষার্থে দরকার মতো ক্ষতিকারক বেঞ্জোকুইনোন তৈরি করা যায়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় রিঅ্যাকশন চেম্বারের প্রবেশ মুখের কপাটিকা গুলি বন্ধ হয়ে যায়, তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফলে উৎপন্ন ঐ ক্ষতিকারক উত্তপ্ত তরল পদার্থ রিঅ্যাকশন চেম্বার থেকে বোমারু গুবরে পোকার দেহের অন্যান্য অংশে যেতে পারে না, উন্মুক্ত (open) পায়ুছিদ্রের (anus) মাধ্যমে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় ও বোমারু গুবরে পোকা নিজে সুরক্ষিত থাকে। তাছাড়া রিঅ্যাকশন চেম্বারের ভেতরের দেওয়াল বেশ পুরু ও শক্ত হওয়ায় বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপ ও ক্ষতিকারক বেঞ্জোকুইনোন থেকে বোমারু গুবরে পোকার নিজের কোনো ক্ষতি হয় না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতারক বোমারু গুবরে পোকা (false bombardier beetle) নামক একধরণের গুবরে পোকা আছে। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Galerita*; এদের বহিরাকৃতি (morphology) ও দেহের বর্ণ অনেকটাই *Brachinus* নামক বোমারু গুবরে পোকার মতো, যদিও এরা আসল বোমারু গুবরে পোকাদের থেকে আকারে সামান্য বড় হয় । বহিরাকৃতি ও দেহের বর্ণে মিল থাকার কারণে অন্যান্য অনেক প্রাণীরা এদের আসল বোমারু গুবরে পোকা ভেবে এড়িয়ে চলে। প্রতারক বোমারু গুবরে পোকারা আত্মরক্ষার জন্য নিজের দেহে ঘনীভূত (concentrated) ফরমিক অ্যাসিড (formic acid), অ্যাসিটিক অ্যাসিড (acetic acid), কিছু হাইড্রোকার্বন (long-chain hydrocarbon) ও কিছু এস্টারের (ester) একটি মিশ্রণ তৈরি করে তা শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করে। ফর্মিক অ্যাসিড একটি দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ যা মেরুদন্ডী এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীদের পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রতারক বোমারু গুবরে পোকাদের উদরদেশে একজোড়া

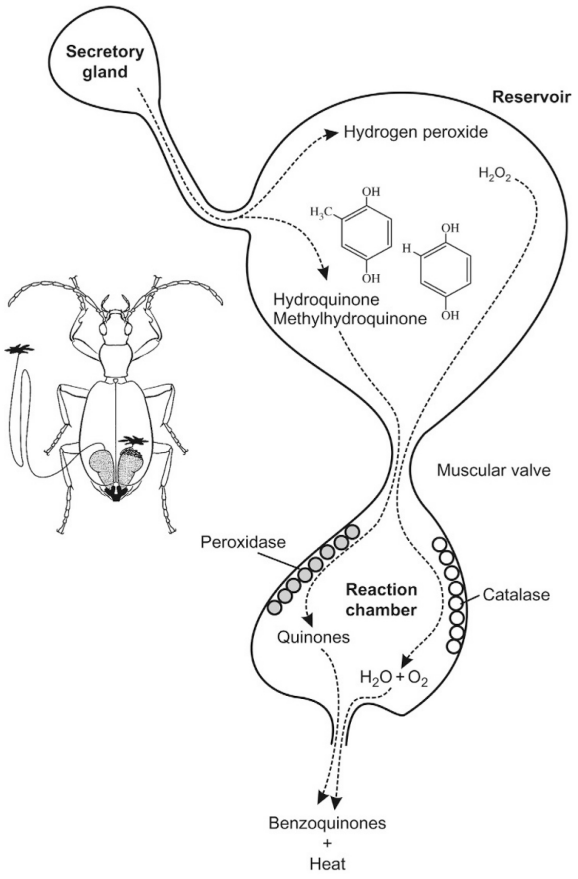

গ্রন্থি (gland) থাকে এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থিতে কেবলমাত্র দুটি প্রকোষ্ঠ (chamber) থাকে যথা সঞ্চয়-প্রকোষ্ঠ (reservoir) এবং ডেলিভারি (delivery) প্রকোষ্ঠ। ডেলিভারি প্রকোষ্ঠের চারপাশে কম্প্রেসর পেশি (compressor muscle) থাকে যেটির সংকোচনের (contraction) মাধ্যমে এরা অ্যাসিড মিশ্রণ শত্রুর দিকে ছুড়ে দেয়। আসল বোমারু গুবরে পোকা একটানা প্রায় 20 বার শত্রুর দিকে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতিকারক ফুটন্ত তরল মিশ্রণ নিক্ষেপ করতে পারে এবং প্রতিটি নিক্ষেপণের ব্যাপ্তিকাল (duration) প্রায় 40–50 মিলিসেকেন্ড (millisecond) হয়। প্রতারক বোমারু গুবরে পোকা অত ঘন ঘন শত্রুর দিকে তার অ্যাসিড মিশ্রণ নিক্ষেপ করতে পারে না; সে তার অ্যাসিড মিশ্রণ কেবলমাত্র 5 থেকে 6 মিলিসেকেন্ড সময় ধরে শত্রুর দিকে ছুড়তে পারে। এইরকম ভাবে ছয়-সাত বার শত্রুর দিকে অ্যাসিড মিশ্রণ নিক্ষেপ করলে এদের অ্যাসিডের সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়। একবার অ্যাসিডের সঞ্চয় শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ফরমিক অ্যাসিডের ভাণ্ডার তৈরি করতে প্রতারক বোমারু গুবরে পোকা পাঁচ সপ্তাহ সময় নেয়।

বোমারু গুবরে পোকাদের আত্মরক্ষার পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন যার মাধ্যমে স্প্রে (spray) করার সময় উষ্ণতা এবং স্প্রে করা পদার্থের কণাগুলির আকার ও আয়তন নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা

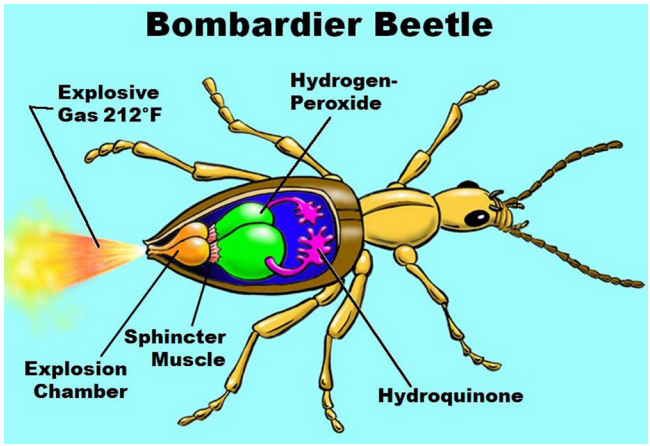

যায়। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (fire extinguisher), নেবুলাইজার (nebulizer) এবং মোটর গাড়ির জ্বালানি ইনজেকশন সিস্টেম (fuel injection system) তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ●

*লেখক **ডঃ সৌরভ সোম** কলকাতার ভৈরব গাংগুলি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: sauravshome48@gmail.

... ১৫ পৃষ্ঠার পর

জ্ঞানকে জার্নাল থেকে সমাজে পৌঁছাতে হয়। বিশ্বাস গড়তে হয়। ভুলতথ্য মোকাবিলা করতে হয়। জনবোঝাপড়া শক্তিশালী করতে হয়। এই ক্ষেত্রে ভারতে নারীরা রূপান্তরমূলক ভূমিকা রাখতে পারেন।

শিক্ষক, বিজ্ঞান যোগাযোগক, সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, জনস্বাস্থ্য-সঞ্চারক ও কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে নারীরা সমাজে বৈজ্ঞানিক নাগরিকত্ব শক্তিশালী করতে পারেন। সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক উপায়ে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হলে এবং সেই ব্যাখ্যার নেতৃত্ব নারীরা দিলে বহুগুণ প্রভাব পড়ে—জনবোঝাপড়া বাড়ে, ভয় কমে, এবং কিশোরীদের মধ্যে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন জন্মায়। ফলে বিজ্ঞান যোগাযোগ কেবল তথ্য ছড়ানোর কাজ নয়; এটি অংশগ্রহণ বিস্তারের ও দীর্ঘমেয়াদি বৈজ্ঞানিক মনন গড়ার নীতিগত হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

2047–এর জন্য ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন এক বিজ্ঞান বাস্তুতন্ত্র দাবি করে যা নকশাগতভাবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যগতভাবে স্থিতিস্থাপক। এর অর্থ, নীতিকে বিস্তৃত অভিপ্রায় থেকে পরিমাপযোগ্য সংস্কারে যেতে হবে। প্রথম ধাপ হওয়া উচিত ভর্তি নয়, টিকে থাকা ও অগ্রগতির ট্র্যাকিং। কতজন নারী STEM শিক্ষা থেকে গবেষণায় যান, কতজন বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদে পৌঁছান, কতজন অর্থায়িত প্রকল্পের নেতৃত্ব দেন, কতজন ডিপ-টেক উদ্যোক্তা হন, এবং কতজন জাতীয় উপদেষ্টা মণ্ডলে অংশ নেন—এসব নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা দরকার। নজরদারি না থাকলে লিকেজ অদৃশ্যই থেকে যায়।

দ্বিতীয় ধাপ হলো শিশু পরিচর্যা ও পরিচর্যা সহায়তাকে গবেষণা পরিকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তুতন্ত্র নারীদের অবৈতনিক গৃহশ্রমের ওপর নির্ভর করতে পারে না। অর্থায়ন কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় এমন সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে ক্ষতি ছাড়াই ক্যারিয়ারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

তৃতীয় ধাপ হলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরকে বাধ্যতামূলক করা। যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারি গবেষণা তহবিল পায়, তাদের কাছ থেকে সমতা-ব্যবস্থা, স্বচ্ছ নিয়োগ ও পদোন্নতির মানদণ্ড, কার্যকর হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা, এবং নারীদের জন্য নেতৃত্বের পথ তৈরি করে এমন মেন্টরশিপ কাঠামো প্রদর্শনের প্রত্যাশা থাকা উচিত।

সবশেষে, সীমান্তবর্তী বিজ্ঞান মিশনে নারীদের দৃশ্যমান ও ক্ষমতাবান করতে হবে। কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিনোমিক্স, পরিচ্ছন্ন শক্তি, মহাকাশ ব্যবস্থা ও জলবায়ু প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে। এসব মিশনে নারীরা কেবল কর্মী নয়—নেতৃত্ব দেবেন। জাতীয় বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বে জাতীয় সমাজের প্রতিফলন থাকতে হবে। ●

***আরুবা রইস** পুদুচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ছাত্রী। ইমেল: arubarais@gmail.com*
***অধ্যাপক মোহাম্মদ রইস** CSIR–NISCPR–এর প্রাক্তন বিজ্ঞানী। ইমেল: Mohammad_rais@gmail.com*

হল ক্রিয়া (Hall Effect) আবিষ্কারের সুলুক সন্ধানে

প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী

বিজ্ঞানের আঙিনায় কিছু ভুল বা নজর এড়িয়ে যাওয়া ঘটনা থেকেই যে অনেকসময় সত্যের জন্ম হয়—এই কাহিনী তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। উনিশ শতকের সাতের দশক। বিদ্যুৎ ও চৌম্বকত্ব তখনো পদার্থবিদদের কাছে কিছুটা রহস্যময় এক জগৎ। দুটি কি নিছকই দুই বিচ্ছিন্ন পরিঘটনা, নাকি কোথাও তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র লুকিয়ে রয়েছে, তার কিছুটা আভাস মিললেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে যেন পৌঁছোনো যাচ্ছে না। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে খানিকটা যোগাযোগের ইঙ্গিত দিলেও কিছু ফাঁকফোকরও যেন থেকে যাচ্ছে।

সেই সময় বিজ্ঞানের ইতিহাসে আবির্ভূত হলো এক বিখ্যাত বই—জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এর লেখা *A Treatise on Electricity and Magnetism* এর প্রথম সংস্করণ। 1873 সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থ, বিদ্যুৎ ও চৌম্বকত্বকে এক অভূতপূর্ব ঐক্যে বাঁধল। কিন্তু সেই বইয়ের পাতায় পাতায়, গাণিতিক সৌন্দর্য ও তাত্ত্বিক গভীরতার মাঝখানেই লুকিয়ে ছিল একটি ছোট্ট বাক্য—যা অজান্তেই হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের সূচনার চাবিকাঠি।

ম্যাক্সওয়েল সেখানে বিদ্যুৎপ্রবাহের ওপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

> "এ কথাটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে যান্ত্রিক বল একটি পরিবাহীকে চালিত করে ... সেই বলটি বিদ্যুৎপ্রবাহের ওপর নয়, বরং যে পরিবাহীটি বিদ্যুৎপ্রবাহ বহন করে, তার উপরই ক্রিয়া করে।" ("It must be carefully remembered that the mechanical force which urges a conductor ... acts, not on the electric current, but on the conductor which carries it.")

এই কথাটি পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্তি জাগাতে পারে। কারণ বক্তব্যটি ছিল দৃঢ় ও আপাতদৃষ্টিতে চূড়ান্ত—চৌম্বক বল যেন প্রবাহের ওপর নয়, বরং কেবল পরিবাহকের ওপরই কাজ করে। ম্যাক্সওয়েলের মতো এক মহান বিজ্ঞানীর কলম থেকে বেরোনো বলে বহুজনই এটিকে প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু 1878 সালে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণিকক্ষে এই বাক্যটি এক তরুণ ছাত্রের মনে অস্বস্তি তৈরি

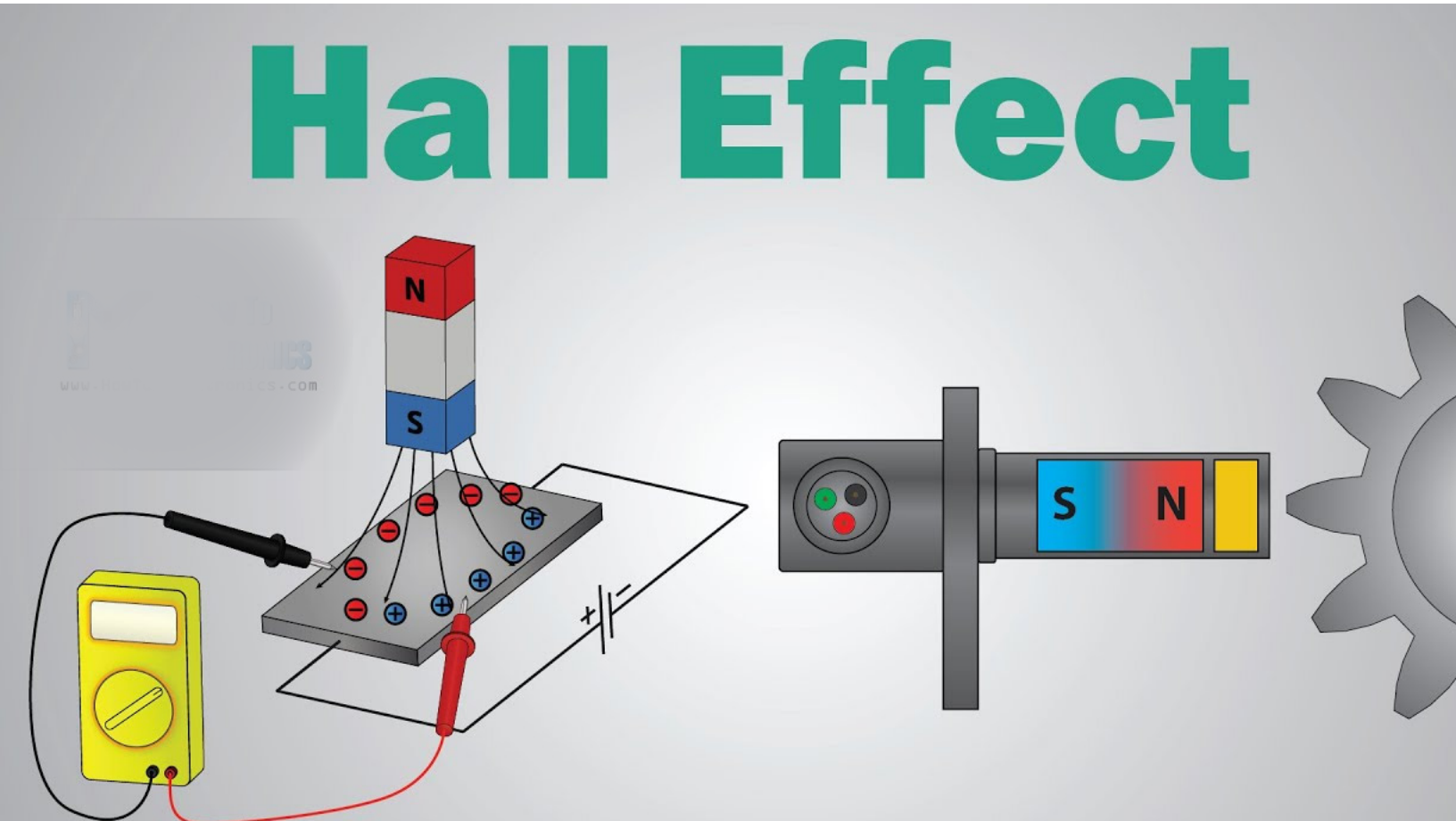

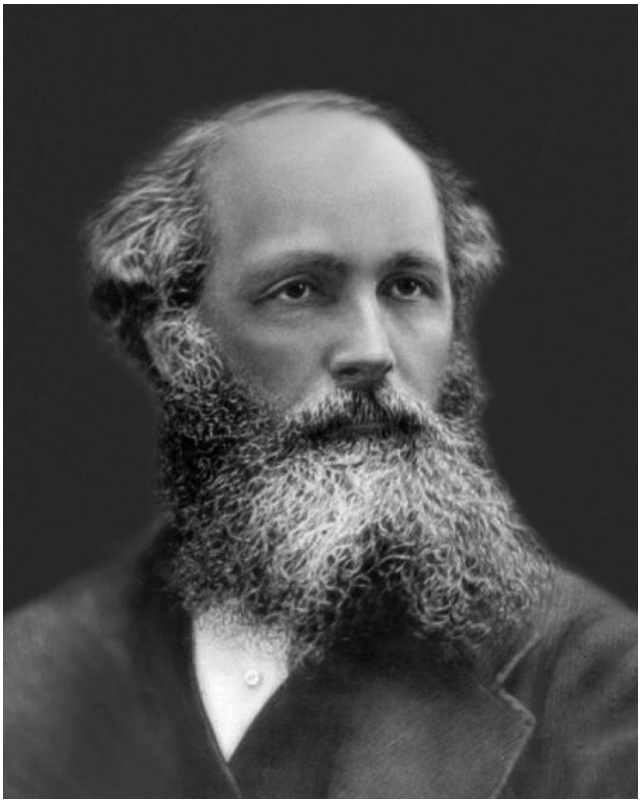

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

এডউইন হার্বার্ট হল (সূত্র: উইকিপিডিয়া)

করল। তার নাম এডউইন হার্বার্ট হল (Edwin Herbert Hall)। অধ্যাপক হেনরি রোল্যান্ড (Henry Rowland) এর ক্লাসে বসে ম্যাক্সওয়েলের বই পড়তে পড়তেই হল প্রশ্ন তুললেন—এই বক্তব্য কি সত্যিই নির্ভুল?

রোল্যান্ড উত্তরে বলেছিলেন, তিনি নিজেও নাকি এই দাবির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন এবং আগেও একবার তাড়াহুড়ো করে একটি পরীক্ষা করেছিলেন—যদিও তাতে সাফল্য আসেনি। এই স্বীকারোক্তি যেন হলের মনে নতুন কিছু চেষ্টার শিখা জ্বালিয়ে দিল। প্রথমে হল অন্য পথে এগোলেন। তিনি চেষ্টা করলেন চৌম্বকীয় রোধ (magneto-resistance) পরিমাপ করার—অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবাহীর বৈদ্যুতিক রোধে কতটা পরিবর্তন নিয়ে আসে।। আমরা এখন জানি, এই কঠিন পরীক্ষায় পরিমাপ হওয়া প্রয়োজন অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অতিমাত্রার সংবেদনশীল যন্ত্র ছাড়া তা ধরা শক্ত। বাস্তবে গবেষক হলের সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, ম্যাক্সওয়েলের চিন্তা বা বক্তব্য অটুটই রইল। কিন্তু অপরিসীম কৌতূহল যাচাই না করে হল মনকে নিরস্ত করতে দিল না। তিনি আবার ফিরে এলেন রোল্যান্ডের পুরোনো পরীক্ষায়, তবে একটি গভীর চিন্তাপ্রসূত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে। ধাতব দণ্ডের বদলে তিনি ব্যবহার করলেন অত্যন্ত পাতলা একটি সোনার পাত, যাকে পরিভাষায় বলা যায় স্বর্ণপত্র বা gold leaf। দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব ধরার জন্য এর চেয়ে সংবেদনশীল মাধ্যম আর কী হতে পারে? এইবার প্রকৃতি নিজের উত্তর দিল। কিংবা বলা যায়, প্রকৃতিকে বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনায় সাড়া দিতেই হলো।

চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে সোনার পাত বরাবর প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহের আধানগুলো পাশের দিকে সরে যেতে লাগল। পাতের দুই প্রান্তে জমে উঠল বিপরীতধর্মী আধান। এর ফলে পাতের দুই পাশের মধ্যে তৈরি হলো একটি ক্ষুদ্র কিন্তু স্থায়ী বিভব পার্থক্য। গ্যালভানোমিটারের সূচক নড়ে উঠল—নিঃশব্দে, কিন্তু অকাট্যভাবে। এই পার্শ্বীয় বিভব পার্থক্যই হলো ‘হল বিভব’ (Hall voltage)। আর এই পরিঘটনাই ইতিহাসে পরিচিত হলো ‘হল ক্রিয়া’ (Hall effect) নামে।

একটু সবিস্তারে বলা যাক এই ব্যাপারটা। বিদ্যুৎপ্রবাহ যখন কোনো পরিবাহী বা অর্ধপরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, এবং সেই পরিবাহীটির ওপর যদি বিদ্যুৎপ্রবাহের লম্বভাবে একটি চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন ভেতরের চলমান আধানগুলো বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকক্ষেত্রের দুটোরই উপর লম্ব অন্য আর এক দিকে এক বলের অস্তিত্ব অনুভব করে। এই বলটির নাম লোরেন্‌ৎস (Lorentz) বল। এই বল আধানগুলিকে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় নতুন এই বলের অভিমুখে।

আধানগুলোর যাওয়ার পথে এই বেঁকে যাওয়ার ফলেই পরিবাহীটির এক প্রান্তে জমা হতে থাকে এক ধরনের আধান, আর বিপরীত প্রান্তে জমে ওঠে বিপরীতধর্মী আধান। ধীরে ধীরে এই আধান-বিচ্ছেদের ফলে পরিবাহীর দুই পার্শ্বপ্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি হয় এই হল ভোল্টেজ। হ্যাঁ, আবার একটি ব্যাপার আছে। দুই প্রকার আধান দুপাশে সরে যাওয়ার কারণে তৈরী হয় বৈদ্যুতিক বল। যখন এই বৈদ্যুতিক বল ঠিক লোরেন্‌ৎস বলের সমান ও বিপরীত হয়ে যায়, তখন পুরো ব্যবস্থাটি (system)

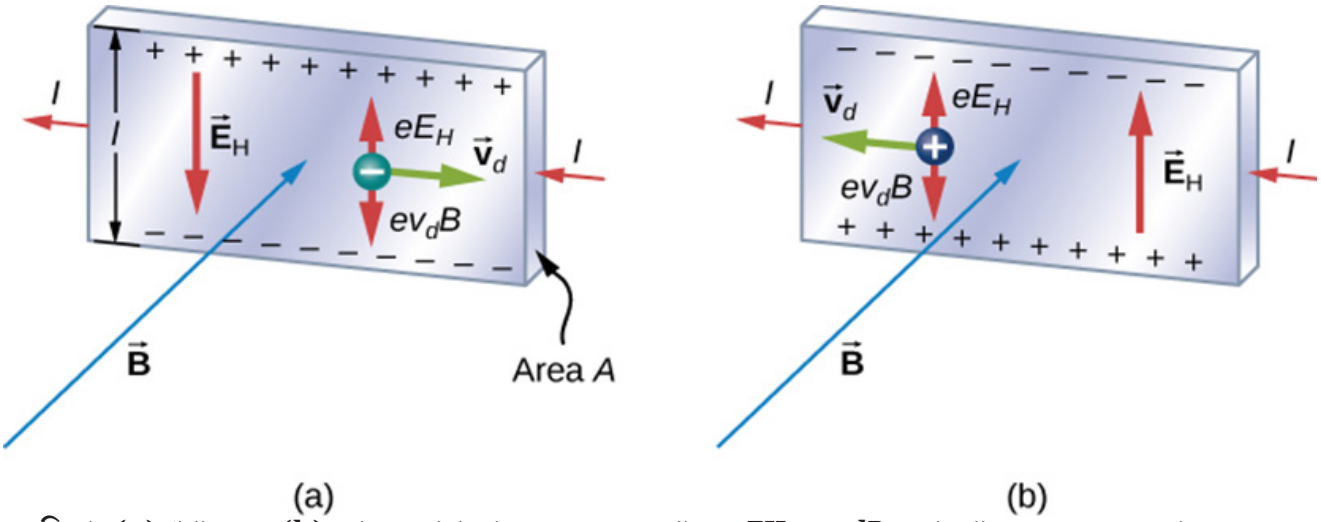

হল ক্রিয়া - (a) ঋণাত্মক ও (b) ধনাত্মক আধানবাহকের ক্ষেত্রে। এখানে, eEH ও evdB হলো যথাক্রমে হল বল ও লোরেন্‌ৎস বল। E_H হলো হল ক্ষেত্র (Hall Field) এবং v_d হলো ঋণাত্মক বা ধনাত্মক আধানবাহকের দ্রুতি।

সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়। সেক্ষত্রে আধানগুলির দুপাশে সরে যাওয়া বন্ধ হয়, কিন্তু বিভব পার্থক্যটি স্থায়ীভাবে বজায় থাকে, যতক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। এইভাবে উদ্ভূত বিভব প্রভেদের নাম আবিষ্কর্তার নাম থেকে হয়েছে হল ভোল্টেজ।

1879 সালে হল তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। পরিতাপের বিষয়, সেই বছরই মাত্র 48 বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলেন ম্যাক্সওয়েল। তবে গল্প কাহিনী কিন্তু এখানেই শেষ নয়। 1881 সালে প্রকাশিত *A Treatise on Electricity and Magnetism*–এর দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদক একটি মার্জিত পাদটীকা যোগ করলেন— "মি. হল আবিষ্কার করেছেন যে, একটি স্থির চৌম্বক ক্ষেত্র অধিকাংশ পরিবাহীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের বণ্টনকে সামান্য পরিমাণে পরিবর্তিত করে; সুতরাং উক্ত বক্তব্যটি ... কেবল সত্যের কাছাকাছি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।" ["Mr. Hall has discovered that a steady magnetic field does slightly alter the distribution of currents in most conductors so that the statement ... must be regarded as only approximately true."] এই কয়েকটি শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিজ্ঞানের প্রকৃত সৌন্দর্য—ভুল স্বীকার করার সাহস, আর তার মধ্য দিয়েই অগ্রগতির পথ।

পরবর্তীকালে জানা গেল, হল বিভব এর মান শুধু পরিবাহীর প্রকৃতির ওপরই নির্ভর করে না, কখনো কখনো তার চিহ্নও পাল্টে যায়। এই বৈশিষ্ট্য হল ক্রিয়াকে পরিণত করল এক শক্তিশালী বিশ্লেষণী যন্ত্রে। বিদ্যুৎধারার প্রকৃত বাহক কে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই জন্ম নিল ধনাত্মক তড়িতগ্রস্ত আধান "হোল" (hole)-এর ধারণা। আসলে, এই হল ভোল্টেজের মান অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহের মান, প্রয়োগ করা চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা, বিদ্যুৎপ্রবাহের বাহক কণাগুলির প্রকৃতি (ঋণাত্মক ইলেকট্রন না কি ধনাত্মক হোল), এবং সর্বোপরি, আধানবাহকের ঘনত্ব। এই কারণেই অর্ধপরিবাহী পদার্থে হল প্রভাব অনেক বেশি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে আধানবাহকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় সামান্য চৌম্বক ক্ষেত্রেও বড়সড় হল ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। বিপরীতে, ধাতুতে আধানবাহকের ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি হওয়ায় হল প্রভাব তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

আজকের দিনে হল ক্রিয়া আর কেবল পাঠ্যবইয়ের বিষয় নয়। এর ব্যবহার ছড়িয়ে আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অজস্র প্রযুক্তিতে। হল সেন্সর (Hall Sensor) দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপ করা হয়। হল সেন্সরের ভেতরে থাকে একটি ক্ষুদ্র অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী পাত। যখন এর মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হয়, তখন পাতের দুই বিপরীত প্রান্তে কোনো অতিরিক্ত বিভব নেই। কিন্তু হঠাৎই যদি তার আশপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র থাকে, বিশেষ করে বিদ্যুৎপ্রবাহের লম্বভাবে, তখন গল্প বদলে যায়। তৈরী হয় স্পষ্ট বিভব পার্থক্য অর্থাৎ হল ভোল্টেজ। হল সেন্সরের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক পরিমাপক। যত শক্তিশালী হয় চৌম্বক ক্ষেত্র, ততই বাড়ে হল ভোল্টেজ। সেন্সরটি এই বিভব পার্থক্যকে "পড়ে" ফেলে এবং আগে থেকেই জানা একটি ক্যালিব্রেশন বা অংশাঙ্কন সূত্রের সাহায্যে তাকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মানে রূপান্তর করে দেয়। হল সেন্সর ব্যবহার করে গাড়ির ইঞ্জিনে অংশগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়, এমনকি স্মার্টফোনের ভেতরে থাকা সেন্সরগুলো আমাদের ফোনের দিকনির্দেশ ও অভিমুখ নির্ধারণ করতেও হল ক্রিয়ার সাহায্য নেয়।

গোড়াতে এই হল ক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞানের পরিসরে। কিন্তু অতি শীতল তাপমাত্রা তৈরি করার প্রযুক্তি যখন পাওয়া গেল, বিজ্ঞানীরা তখন অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায়, প্রায় পরম শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে এই হল ক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। পাতলা অর্ধপরিবাহী স্তরে হল প্রভাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল এক বিস্ময়কর আচরণ। হল ভোল্টেজ আর মসৃণভাবে টানা বদলাচ্ছে না। বরং এটি কতগুলি ধাপে ধাপে,

ক্লাউস ভন ক্লিৎসিং (Klaus von Klitzing)

সিঁড়ির মতো করে বদলাচ্ছে। এই নতুন ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাই হলো কোয়ান্টাম হল ক্রিয়া (Quantum Hall Effect)।

1980 সালে জার্মান পদার্থবিদ ক্লাউস ভন ক্লিৎসিং (Klaus von Klitzing) প্রথম এই ঘটনাটি আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষায় দেখা যায়, বিশেষ অবস্থায় হল পরিবাহিতা (Hall conductance) আর ইচ্ছেমতো যে কোন মান নেয় না। এটি কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট মানেই উপস্থিত থাকতে পারে—যেগুলো নির্ধারিত হয় কিছু মৌলিক প্রাকৃতিক ধ্রুবকগুলোর দ্বারা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই মানগুলো এতটাই নির্ভুল যে সেগুলোতে কোনো পদার্থের ত্রুটি, অমেধ্য বা গঠনগত খুঁত প্রায় কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না। এর মূল নীতিটা খুব সহজ করে বললে এমন—শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলো আর স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে না। তাদের গতি কোয়ান্টাম নিয়মে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, এবং তারা বিশেষ বিশেষ শক্তিস্তরে বন্দি হয়—যেগুলোকে বলা হয় ল্যান্ডাউ স্তর (Landau Level)। বিদ্যুৎপ্রবাহ তখন মূলত পরিবাহীর কিনারা ধরে বয়ে যায়, তখন এই প্রান্তীয় গতি এতটাই স্থিতিশীল যে সামান্য বিঘ্নেও তা নষ্ট হয় না। ফলাফল হিসেবে হল পরিবাহিতা হয়ে ওঠে কোয়ান্টাইজড—অর্থাৎ ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট মানে আবদ্ধ। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এতটাই গভীর ছিল যে 1985 সালে ভন ক্লিৎসিং পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

আজ কোয়ান্টাম হল ক্রিয়া শুধু কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিস্ময় নয়, বরং এটি বৈদ্যুতিক রোধের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়। এই আবিষ্কারটি বৈদ্যুতিক রোধের ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবহারিক মান (practical standard) নির্ধারণের সুযোগ করে দিয়েছে, যা ভন ক্লিৎসিং ধ্রুবক R_K (= h/e^2 যেখানে h হল প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ও e = ইলেক্ট্রনের আধান) এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এছাড়াও, কোয়ান্টাম হল ক্রিয়া দ্বারা আমরা সূক্ষ্ম-গঠন ধ্রুবক (fine-structure constant)-এর একটি অত্যন্ত নিখুঁতমান বের করতে সক্ষম হয়েছি। এই ধ্রুবকটি কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিদ্যা (quantum electrodynamics)-র ক্ষেত্রে মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাশি।

এইভাবেই, এক মহাবিজ্ঞানীর একটি ভুল মন্তব্য থেকেই উন্মোচিত হলো নতুন এক অধ্যায়। কারণ বিজ্ঞানে 'ভুল' কখনোই নিষ্ফল নয়—সঠিক হাতে পড়লে, সেটিও সত্যের পথ দেখায়। ম্যাক্সওয়েল ভুল করেছিলেন। আর সেই 'ভুল'ই ইতিহাসকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। 1878 সালের এক নিঃশব্দ পরীক্ষাগারে শুরু হওয়া যে ছোট্ট কৌতূহল একদিন ম্যাক্সওয়েলের একটি বক্তব্যকে প্রশ্ন করেছিল, সেটিই আজ আধুনিক প্রযুক্তির এক অপরিহার্য ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, সভ্যতার দৈনন্দিন জীবনের গভীরে শিকড় গেড়েছে। এটি শুরু হয়েছিল একটি সোনার পাত আর একটি গ্যালভানোমিটার দিয়ে। আর তারই পরিণতি আজ মৌলিক ধ্রুবক, কোয়ান্টাম স্তর, আর নিখুঁত মানের বিজ্ঞানে। এইভাবেই হল ক্রিয়ার গল্প ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে কোয়ান্টাম জগতের গভীরে। হল ক্রিয়া আবিষ্কার কেবল এক ইতিহাসের মাইলস্টোন নয়, তার ভূমিকা যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রমাণিত হয়েছে। ●

*লেখক **ডঃ প্রদীপ্ত পঞ্চাধ্যায়ী** কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, লোকবিজ্ঞান প্রচারক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: ppcontai@gmail.com

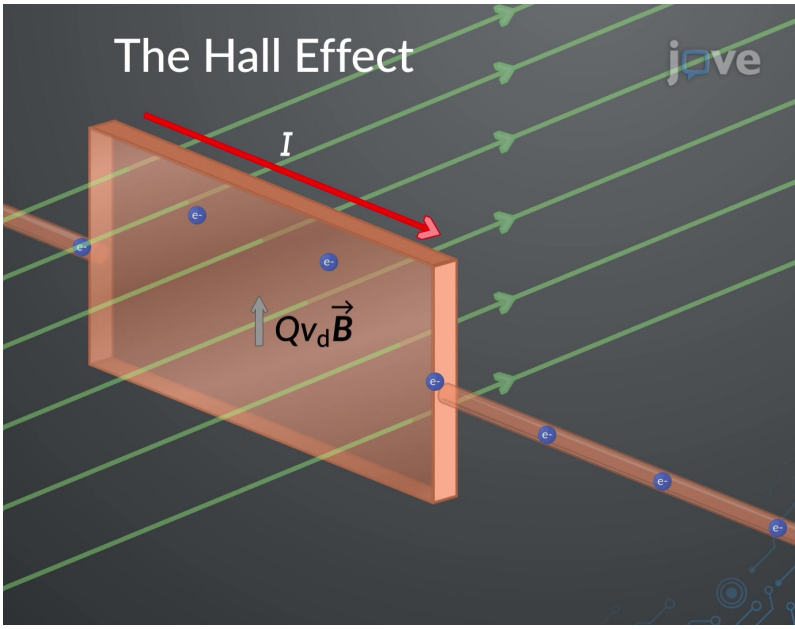

সোঁদাল ওরফে অমলতাস

দীপাঞ্জন ঘোষ

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের পাতা ওল্টাতে বসে সপ্তম পরিচ্ছেদে এসে এক জায়গায় সেদিন চোখ আটকে গেল। দেখি লেখা আছে: ‘অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকীর মোহনা হইতে প্রবহমাণ জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।’ শৈশবের নস্টালজিয়া, গ্রামীণ সৌন্দর্য এবং অবশ্যই প্রকৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের গভীর অনুরাগের প্রতীক এই লাইনগুলো। সোঁদাল নামের দেশীয় বৃক্ষটিকে সাধারণত বনাঞ্চলে বা রাস্তার ধারে জন্মাতে দেখা যায়। কখনো বা শখ করে বাগানেও লাগানো হয়।

বসন্তের শেষে লম্বা লম্বা শাখায় সাজানো অবস্থায় অতীব সুন্দর ফুল হালকা হাওয়ায় দুলতে থাকে। অনেকে মনে করেন, সোনালী হলুদ রঙের ফুলের বাহার থেকেই ‘সোঁদাল’ নামের উৎপত্তি।

চিত্র 1: সব ডালে একসাথে ফুল ফুটলে সোনালী আলোকচ্ছটায় চারিপাশ যেন আলোকিত হয়ে ওঠে।

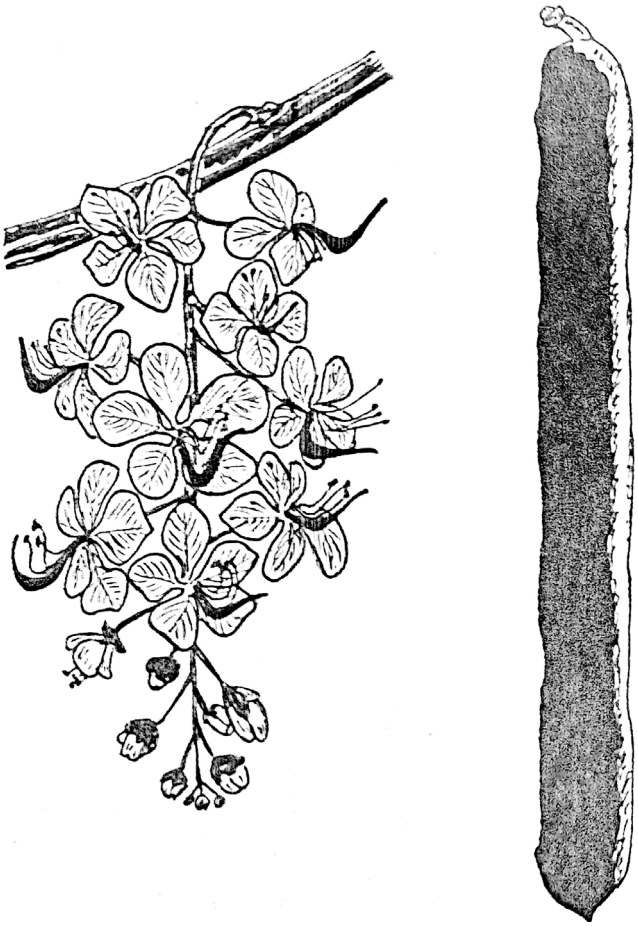

চিত্র 2: সোঁদালের পুষ্পমঞ্জরী এবং একটি পরিণত ফল।

মাইকেল মধুসূদনের কাব্যেও সোঁদাল প্রতীয়মান, তবে ‘কর্ণিকা’ নামে। মধু কবি তাঁর ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যের প্রথম সর্গে এক জায়গায় লিখেছেন:

‘হায়, কর্ণিকা অভাগা
বরবর্ণ বৃথা যায় সৌরভ বিহনে
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন’।

আসলে, মহাকবি কালিদাস থেকে তুলসীদাস হয়ে শেষে আমাদের রবীন্দ্রনাথ, সকলেই কোন না কোন সময়ে সোঁদালের রূপে মজেছেন। শুনেছি বাংলায় ‘অমলতাস’ নামটির প্রচলন ঘটেছিল কবিগুরুর হাত ধরেই।

সোঁদাল নানা জায়গায় নানা নামে পরিচিত। ইংরাজীতে এদের বলা হয়, ‘গোল্ডেন শাওয়ার ট্রি’, ‘গোল্ডেন রেন’, ‘ইন্ডিয়ান ল্যাবারনাম’, ‘পুডিং পাইপ ট্রি’; সংস্কৃতে ‘কর্ণিকার’; হিন্দিতে বলে ‘অমলতাস’, ‘বান্দর লাউরি’, ‘গিরমালাহ’; বাংলায় বলে ‘সোনালু’ বা ‘বাঁদর লাঠি’। অবশ্য, উদ্ভিদ জগতে সোঁদাল ওরফে অমলতাস *Cassia fistula* নামে পরিচিত। গ্রীক শব্দ ‘*Cassia*’ অর্থে ‘সুগন্ধীযুক্ত ছাল’ এবং ল্যাটিন শব্দ ‘*fistula*’ অর্থে ‘পাইপ’ অর্থাৎ ‘নলাকার’ ফল। এরা ফ্যাবেসি (Fabaceae) গোত্রের উদ্ভিদ।

সোঁদাল গাছের আদি বাসভূমি হিমালয় পর্বতের পাদদেশে মনে করা হলেও ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মায়ানমার

চিত্র 3: ভারত সরকারের ডাক বিভাগ 2000 সালের 20 শে নভেম্বর অমলতাসের এই 20 টাকা দামের ডাকটিকিটটি প্রকাশ করেন।

সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে গাছটির বিস্তার। এমনকি, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যান্ডেও এদের দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি যে, অমলতাস বা সোঁদাল থাইল্যান্ডের জাতীয় ফুল। আবার একই সঙ্গে সোঁদাল ভারতের কেরালা রাজ্যেরও রাজ্য পুষ্প হিসাবে স্বীকৃত।

উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু জমি সোঁদাল গাছ জন্মানোর পক্ষে উপযোগী। এক-একটি পরিণত গাছ সাধারণত 8–10 মিটার লম্বা হয়। সোঁদাল গাছের শাখা প্রশাখা কম, কান্ড সোজা ভাবে উপরের দিকে বাড়তে থাকে, বাকল সবুজাভ সাদা থেকে ধুসর রঙের, কাঠ মাঝারি শক্ত, খুব একটা উচ্চমানের নয়। পাতা একান্তর (Alternate) ভাবে বিন্যস্ত, অচূড় পক্ষল; মসৃণ বড় ডিম্বাকার 4–6 জোড়া পত্রক নিয়ে গঠিত। গাছের কচিপাতা তামাটে লাল রঙের হয়ে থাকে। অপরিণত

চিত্র 4: বসন্তের শেষে অতীব সুন্দর সোঁদাল ফুল হালকা হাওয়ায় দুলতে থাকে।

পাতাগুলি মুড়ে থাকে এবং নুইয়ে পড়ে। পরিণত পাতা হালকা সবুজ রঙের, মধ্যশিরা স্পষ্ট এবং পাতার নিম্ন পৃষ্ঠ সাদা সাদা রেশমী রোম যুক্ত হয়। সোঁদাল পর্ণমোচী বৃক্ষ। শীতের শুরুতে পাতা ঝরতে শুরু করে। একসময় সমস্ত পাতা ঝরে গিয়ে গাছ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। বসন্তের শেষে ফুল আসার আগে গাছে নতুন পাতা গজায়।

গ্রীষ্মের শুরুতে এপ্রিল-মে মাসে সোঁদালের নেড়া ডালে সোনালী হলুদ ফুল ফুটতে শুরু করে। পরবর্তী দুই-তিন মাস অর্থাৎ পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে সোঁদালের ডালে ডালে যেন হলুদ ফুলের মেঘ জমে থাকে। ফুলগুলি 30–35 সেন্টিমিটার লম্বা মঞ্জরীদণ্ডের (Panicle) উপর অনিয়তভাবে সাজানো থাকে। হালকা মিষ্টি গন্ধযুক্ত ফুলগুলি আকারে গড়ে 3–4 সেন্টিমিটারের মত হয়। ফুলের পাপড়ি পাঁচটি; পাপড়িগুলির কেন্দ্রস্থল থেকে পুংদন্ড পরিবেষ্টিত হয়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের কাস্তের মত বাঁকানো গর্ভকেশরচক্রটি উঁচিয়ে থাকে। ফুল ঝরে গেলে গর্ভাশয়টি প্রায় 30–50 সেন্টিমিটার লম্বা এবং 2.5 সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট নলাকার শুঁটিতে (legume) পরিণত হয়। ফলত্বক মসৃণ; যদিও কাঁচা ফল সবুজ থাকে, পাকলে ফলের রং হয় মেহগনি কাঠের রঙের মত। সোঁদালের ফল একবছর পর্যন্ত গাছে ঝুলে থাকতে পারে। ফলের ভেতর বহু সংখ্যায় বীজ থাকে। বীজ উজ্জ্বল হলুদ আভাযুক্ত ধূসর খয়েরী রঙের এবং বীজত্বক ভীষণ শক্ত। যদিও সমস্ত বীজগুলি একসঙ্গে থাকে না, বরং কয়েকটি করে বীজ ফলের মধ্যে সমদূরত্বে বিন্যস্ত আধুলির আকারের থলির মধ্যে তেঁতুলের মাড়ি বা মজ্জার মত আঠালো চিটচিটে শাঁসের মধ্যে বসানো থাকে। ফল কাঁচা অবস্থায় পাড়লে আঠালো শাঁস পাওয়া যায় না, একমাত্র গাছপাকা ফলেই এটা পাওয়া যায়।

তবে সোঁদাল কেবলমাত্র প্রকৃতির শোভাবর্ধনই করে না। ভেষজ গুণের দিক দিয়ে গাছটির গুরুত্ব অপরিসীম। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসাবে সোঁদালের বিভিন্ন অংশ যথা, ফুল, কচি পাতা, ছাল এবং ফলমজ্জা ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত আছে। সোঁদালের মূল কালাজ্বরের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুকনো সোঁদাল ফল কোষ্ঠবদ্ধতা প্রতিরোধে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফলের আঠা বা ফলমজ্জা আবার রেচক পদার্থ রূপে ব্যবহৃত হয়। সোঁদালের কচি পাতা আমবাতে, চর্মরোগে, ক্ষত নিরাময়ে, ক্ষত বিষিয়ে যাওয়া প্রতিরোধে কাজে দেয়। আবার ডায়রিয়া ও বহুমূত্র রোগ প্রশমনের জন্য যথাক্রমে সোঁদাল গাছের পাতা ও ছালের ব্যবহার বেশ প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে সোঁদাল গাছের কান্ড থেকে একটি লাল রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায় এবং ছাল থেকে পাওয়া যায় ট্যানিন। সবশেষে বলি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও উন্নয়নের ফলে বর্তমানে সোঁদালের প্রাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গাছের সংখ্যা বেশ কিছুটা কমে যাওয়ার কারণে অদূর ভবিষ্যতে সোঁদাল গাছের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। ●

*লেখক **শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষ** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, পত্রিকা সম্পাদক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: dpanjanghosh@gmail.com*

জলচারী লাল ঠেঙ্গির খোঁজে

অমর কুমার নায়ক

আমারা যারা পাখি দেখতে ভালবাসি তারা বাড়ীর কাছেও পাখি খুঁজি সময়ে অসময়ে। অবসর সময়ে পাখি দেখার জন্য আমার বাড়ীর ছাদে কিছুক্ষণ কাটালেই নানান পাখির দেখা মেলে বাড়ীর পেছনে থাকা একটি পুকুর ও তাকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গাছের সুবাদে। এমনি এক ছুটির দিনের কথা, দুপুরে খাওয়ার পর ভাতঘুম না দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে সোজা ছাদে গিয়ে বসলাম। এদিক সেদিক পাখি দেখতে দেখতে হটাৎ দেখি মাথার উপর দিয়ে গোটা চারেক লম্বা পায়ের পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে। কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম চটপট। ছবি তুলে স্ক্রিনে চোখ লাগিয়ে উল্লসিত হয়ে পড়লাম নতুন পাখির দেখা পেয়ে। ওগুলো যে লাল ঠেঙ্গি তা বুঝতে সুবিধা হয়নি। ছবি দেখেছি আর অজয় হোমের ‘চেনা অচেনা পাখি’ বইয়ের পাতায় পড়েছি। আমার বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দামোদর নদ বয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই শ্রীরামপুরে সেই নদীর চরে ছুটে যাই পাখি দেখতে। তাই বুঝলাম সেই নদীর আশেপাশেই কোথাও এরা ঘাঁটি গেড়েছে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। পরের ছুটির দিনে গিয়ে খোঁজ খবর করেও হদিশ পেলাম না। হতাশ না হয়ে খোঁজ চালাতে থাকলাম। অবশেষে প্রায় দেড় বছর পর 2023-এর নভেম্বরে শ্রীরামপুরে দামোদর নদের কাছে একটি বিল থেকে একজোড়া লাল ঠেঙ্গির দেখা পেলাম। 2025 সালের নভেম্বরে দামোদর নদের উপর এবং ডিসেম্বর মাসে আবার সেই বিলটি থেকে এদের দেখা পেলাম। লম্বা ঠ্যাঙের পা নিয়ে জলের মধ্যে থেমে থেমে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। এদের আচার আচরণ দেখলে মনে হয় যেন রণ-পা লাগিয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝেই মুখ ডুবিয়ে খাবার খোঁজ করছিল। অনেকটা সময় আমাদের সামনে খাবার খাওয়ার পর ‘কী...কী...কী’ তীক্ষ্ণ সুরে ডাকতে ডাকতে উড়ে পালাল। পর পর কয়েক বছর এদের আসা যাওয়া দেখে বুঝলাম প্রতি বছর শীতে এরা এই অল্প জলে আসে স্থানীয় পরিযায়ী হয়ে। পাখিটি সম্পর্কে জানার আগ্রহে আবারও উল্টে নিলাম ‘চেনা অচেনা পাখি’-র পাতা। এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে জেনে নেওয়া যাক এদের সম্পর্কে।

লাল ঠেঙ্গির সাধারণ ইংরাজি নাম Black-winged Stilt এবং বিজ্ঞান সম্মত নাম *Himantopus himantopus*। এরা চ্যারাড্রিফর্মস বর্গের অন্তর্গত রেকারভিরোস্ট্রিডি পরিবারের সদস্য। এদের ব্যাপ্তি বিশাল এলাকা জুড়ে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা অবধি বিস্তৃত। ভারতের প্রায় সর্বত্র এদের পাওয়া যায়। সাধারণত শীতে আমাদের এই অঞ্চলে দেখা গেলেও আমি জুন মাসে প্রথম এদের দেখা পেয়েছিলাম। স্থানীয় পরিযায়ী হিসাবে প্রয়োজন অনুসারে দেশের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে।

উড়ন্ত লাল ঠেঙ্গি

জলে মুখ ডুবিয়ে খাই

লাল ঠেঙ্গি

সাধারণত ছোটখাটো জলাশয়, খাল, বিল, পুকুর, জলে ডোবা চাষের জমি, সেচের ক্যানেল এবং নদীর আশেপাশে দেখা যায়। তবে শুধু মিঠে জলে নয় নোনা জলের জলাশয়েও দেখা যায়। এরা দলে জোড়ায় বা একাকী ঘুরে বেড়ায়। অনেক সময় দখা যায় অন্যান্য জলচারী (ওয়েডার্স) পাখিদের সাথে একই দলে ঘুরছে। এরা চিৎকার করে এলাকা মাত করে বিশেষ করে ওড়ার সময়। লম্বা পায়ের জন্য এরা অন্যান্য জলচারী পাখিদের তুলনায় বেশি জলে যেতে পারে। জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খাবারের সন্ধান চালায়। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে একই রকম। সাদা শরীর এবং ধাতব চকচকে কালো রঙের ডানা। ছোট কিন্তু সরু সূচালো লেজ। লম্বা লালচে গোলাপি রঙের পা। কালো রঙের লম্বা সরু ও সোজা চঞ্চু। চোখের কনীনিকা উজ্জ্বল লাল রঙের। স্ত্রীদের মাথার উপরে কালো ছোপ দেখা যায়। শরীরের নীচের অংশের রং সাদা। আকারে 35–40 সে.মি.। এদের দৈহিক গড়ন বেশ ছিপছিপে প্রকৃতির। এদের ওড়ার প্রকৃতি দুর্বল, ওড়ার সময় ঘন ঘন ডানা ঝাপটায়। এরা সাধারণত কেঁচো, কৃমি, জোঁক, জলজ পোকামাকড়, ছোট মাছ এবং জলজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। প্রজনন কাল জানা যায় এপ্রিল থেকে আগস্ট। এরা এই সময় তিন থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বাচ্চাদের সমান ভাবে যত্ন নেয়। বাসার সামনে কারও আগমন ঘটলে ঘোরতর আপত্তি জানায় এবং দ্রুত ডানা নাড়িয়ে একই জায়গায় ওড়াউড়ি করে। এদের জনসংখ্যা স্থিতিশীল এবং আই.ইউ.সি.এন. রেড লিস্ট অনুযায়ী এরা 'লিস্ট কনসার্ন' তালিকাভুক্ত। তবে জলাশয় হ্রাস পাওয়া এবং নদী ও জলাভূমিতে মানুষের বিচরণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এদের সমস্যা হচ্ছে। গত 2'রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জুড়ে পালিত হল বিশ্ব জলাভূমি দিবস। এই বিশেষ দিনের কথা মাথায় রেখে আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি জলজ সম্পদের পুনরুদ্ধার করব এবং জলাশয় ও জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণ প্রকল্প হতে দেব না। জলাভূমি রক্ষা পেলে সুরক্ষিত হবে প্রতিটি জলচারী পাখির জীবন। সুস্থ জলাভূমি, সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের নির্দেশক। ●

লাল ঠেঙ্গির জল ছবি

*লেখক **শ্রী অমর কুমার নায়ক** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের মার্চ মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ওরিয়ন নীহারিকা প্রথম পর্যবেক্ষণ ও তালিকাবদ্ধকরণ

ওরিয়ন নীহারিকা হল মিল্কিওয়ের একটি বিচ্ছুরিত নীহারিকা যা ওরিয়ন নক্ষত্রমণ্ডলে ওরিয়নের বেল্টের দক্ষিণে অবস্থিত এবং ওরিয়নের "তলোয়ার"-এর মধ্যবর্তী "তারা" নামে পরিচিত। এটি মেসিয়ার 42, M42, অথবা এনজিসি 1976 নামেও পরিচিত। এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল নীহারিকাগুলির মধ্যে একটি এবং রাতের আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান। M42-র আনুমানিক দৈর্ঘ্য 25 আলোকবর্ষ এবং এর ভর সূর্যের তুলনায় প্রায় 2000 গুণ বেশি। ওরিয়ন নীহারিকা রাতের আকাশে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং ছবি তোলা বস্তুগুলির মধ্যে একটি এবং এটি সবচেয়ে বেশি অধ্যয়ন করা নৈস্বর্গিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি। গ্যাস এবং ধূলিকণার মেঘ ভেঙে যাওয়ার ফলে তারা এবং গ্রহ ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি হয় তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নীহারিকাটি অনেক কিছু প্রকাশ করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নীহারিকার মধ্যে প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক এবং বাদামী বামন, গ্যাসের তীব্র এবং অস্থির গতি এবং নীহারিকার কাছাকাছি বিশাল তারাগুলির ফটো-আয়নাইজিং প্রভাব সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন। চার্লস মেসিয়ার 1769 সালের 4ঠা মার্চ নীহারিকাটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তিনি ট্র্যাপিজিয়ামের তিনটি তারাও লক্ষ্য করেন। মেসিয়ার 1774 সালে গভীর আকাশের বস্তুর তালিকার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। ওরিয়ন নীহারিকা তার তালিকার 42তম বস্তু হওয়ায় এটি M42 হিসেবে চিহ্নিত হয়। ওরিয়ন নীহারিকার বিচ্ছুরিত নীহারিকা প্রকৃতির প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাধারণত ফরাসি জ্যোতির্বিদ নিকোলাস-ক্লদ ফ্যাব্রি ডি পিরেস্ককে দেওয়া হয়, যিনি 1610 সালের 26 নভেম্বর একটি প্রতিসরণকারী টেলিস্কোপ দিয়ে এটি পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করেছিলেন। ●

আন্তঃগ্রহীয় গামা-রশ্মি বিস্ফোরণ

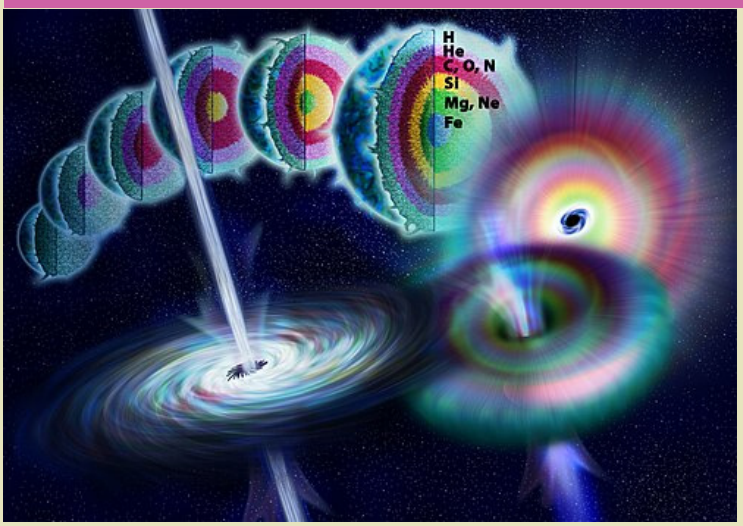

1979 সালের 5 মার্চ তারিখে ইন্টারপ্ল্যানেটারি নেটওয়ার্ক (IPN) এর একাধিক মহাকাশযান, যার মধ্যে সোভিয়েত ভেনেরা 11 এবং 12 এবং মার্কিন HEAO-2 অন্তর্ভুক্ত ছিল, একটি উল্লেখযোগ্য তীব্র গামা-রশ্মি বিস্ফোরণ (GRB) সনাক্ত করে। GB790305 নামক এই ঘটনাটি লার্জ ম্যাগেলানিক ক্লাউড (LMC), বিশেষ করে N49 সুপারনোভা অবশিষ্টাংশের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। বিস্ফোরণটি ছিল অনন্যভাবে তীব্র এবং এর প্রাথমিক স্পাইক ছিল 0.2-সেকেন্ড, যার পরে 200 সেকেন্ডের 8-সেকেন্ডের স্পন্দন, যা একটি ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকাকে নির্দেশ করে। অন্যান্য GRB-এর বিপরীতে, এই উৎসটি পরবর্তী, দুর্বল বিস্ফোরণ তৈরি করেছিল, যার ফলে এই বস্তুগুলিকে সফট গামা রিপিটার (SGR) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। 1992 সালে রবার্ট ডানকান এবং ক্রিস্টোফার থম্পসনের তাত্ত্বিক কাজের পরে এই নির্দিষ্ট ঘটনার উৎস, SGR 0525-66, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সহ একটি নিউট্রন তারকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ঘটনাটিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয় যা ম্যাগনেটার সনাক্তকরণে নেতৃত্ব দেয়। ম্যাগনেটার হলো এমন নিউট্রন তারা যার চৌম্বক ক্ষেত্র 10^{14} থেকে 10^{15} গাউসের কাছাকাছি। ●

মহাকাশে প্রথম হাঁটা

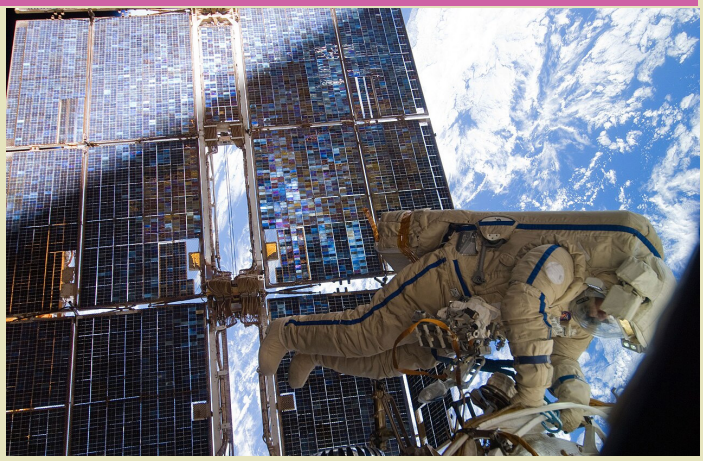

এক্সট্রাভেহিকুলার অ্যাক্টিভিটি (EVA) হল মহাকাশযানের বাইরে মহাকাশে একজন নভোচারীর দ্বারা সম্পাদিত যেকোনো কার্যকলাপ। এর মধ্যে রয়েছে স্পেসওয়াক, চন্দ্র বা গ্রহের পৃষ্ঠ অনুসন্ধান (সাধারণত মুনওয়াক নামে পরিচিত), এবং স্ট্যান্ড-আপ EVA (SEVA) যেখানে নভোচারীরা মহাকাশযানটি সম্পূর্ণরূপে না ছেড়ে একটি খোলা হ্যাচের মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন দ্বারা EVA পরিচালিত হয়েছে, কানাডা, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার মহাকাশচারীরাও এই দেশগুলির দ্বারা পরিচালিত EVA গুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেহেতু বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর মতো নয়, তাই পরিবেশগত সহায়তার জন্য মহাকাশচারী সম্পূর্ণরূপে স্পেস স্যুটের উপর নির্ভরশীল। 1965 সালের 18 মার্চ রুশ মহাকাশচারী আলেক্সি লিওনভ রাশিয়ার ভোসখোদ 2 মিশনের সময় প্রথম 12 মিনিট 9 সেকেন্ড স্থায়ী স্পেসওয়াক পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে নীল আর্মস্ট্রং 1969 সালের 20 জুলাই অ্যাপোলো 11 মিশনের সময় 2 ঘন্টা 31 মিনিট স্থায়ী প্রথম মুনওয়াক করেন। স্বেতলানা সাভিটস্কায়া 1984 সালে স্যালিউট 7 মহাকাশ স্টেশনের বাইরে 3 ঘন্টা 35 মিনিট সময় কাটিয়ে প্রথম মহিলা হিসেবে স্পেসওয়াক পরিচালনা করেন। শেষ তিনটি চন্দ্র অভিযানের নভোচারীরা ফিল্ম ক্যানিস্টার উদ্ধারের জন্য গভীর মহাকাশ EVAও করেছিলেন। 1973 সালে আমেরিকান নভোচারী পিট কনরাড, জোসেফ কেরউইন এবং পল ওয়েইটজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহাকাশ স্টেশন স্কাইল্যাবের লঞ্চের ক্ষতি মেরামত করার জন্য একটি EVA পরিচালনা করেন। EVA গুলি সংযুক্ত হতে পারে, যেখানে মহাকাশচারী অক্সিজেন এবং শক্তির জন্য একটি তারের সাহায্যে মহাকাশযানের সাথে সংযুক্ত থাকে, অথবা সংযুক্ত নাও হতে পারে। 1084 সালে ম্যানড ম্যানুভারিং ইউনিট (MMU) ব্যবহার করে তিনটি মিশনে এবং 1994 সালে স্পেসওয়াকগুলি সিম্পলিফায়েড এইড ফর ইভা রেসকিউ (SAFER) সুরক্ষা ডিভাইসের একটি ফ্লাইট পরীক্ষায় সংযুক্ত না করা হয়েছিল। ●

টাইটান আবিষ্কার

টাইটান হল শনির বৃহত্তম উপগ্রহ এবং সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। এটিই একমাত্র উপগ্রহ যার বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে ঘন এবং পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতের একমাত্র পরিচিত বস্তু যার পৃষ্ঠতলের তরল পদার্থের স্থিতিশীলতার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। টাইটান হল শনির সাতটি মহাকর্ষীয়ভাবে গোলাকার উপগ্রহের মধ্যে একটি এবং তাদের মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে দূরবর্তী। টাইটান পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে ব্যাসে 48.16% বড় এবং 80% বেশি ভরের। এটি বৃহস্পতির গ্যানিমিডের পরে সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ এবং বুধের চেয়েও বড়। যদিও টাইটানের ভর বুধের মাত্র 40%, কারণ বুধ মূলত লোহা এবং শিলা, যেখানে টাইটানের বেশিরভাগ অংশই বরফ, যার ঘনত্ব কম। ডাচ জ্যোতির্বিদ ক্রিস্টিয়ান হাইগেনস 1655 সালের 25শে মার্চ টাইটান আবিষ্কার করেন। 1610 সালে গ্যালিলিওর বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ আবিষ্কার এবং টেলিস্কোপ প্রযুক্তিতে তার অগ্রগতিতে মুগ্ধ হয়ে হাইগেনস তার বড় ভাই কনস্টান্টিজেন হাইগেনস জুনিয়রের সহায়তায় 1650 সালের দিকে টেলিস্কোপ তৈরি শুরু করেন এবং তাদের নির্মিত একটি টেলিস্কোপ দিয়ে শনি প্রদক্ষিণকারী প্রথম পর্যবেক্ষিত উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। হিউগেনস তার আবিষ্কারের নামকরণ করেন স্যাটার্নি লুনা (অথবা লুনা স্যাটার্নি, ল্যাটিন ভাষায় “শনির চাঁদ”)। 1655 সালে “ডি স্যাটার্নি লুনা অবজারভাটিও নোভা” (শনির চাঁদের একটি নতুন পর্যবেক্ষণ) নামক ট্র্যাক্টে তিনি এই আবিষ্কার প্রকাশ করেন। 1673 থেকে 1686 সালের মধ্যে জিওভানি ডোমেনিকো ক্যাসিনি শনির আরও চারটি উপগ্রহের আবিষ্কার প্রকাশ করার পর, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এগুলি এবং টাইটানকে শনি প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত (তখন টাইটান চতুর্থ স্থানে ছিল) উল্লেখ করতে শুরু করেন। টাইটানের অন্যান্য প্রাথমিক নামগুলির একটি হলো শনির সাধারণ উপগ্রহ। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে টাইটানকে “শনি ষষ্ঠ” হিসাবে চিহ্নিত করে। ●

মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

লুইস মিরামন্টেস

লুইস আর্নেস্তো মিরামন্টেস কার্ডেনাস 1925 সালের 16 মার্চ জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন একজন মেক্সিকান রসায়নবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম মৌখিক গর্ভনিরোধক, প্রোজেস্টিন নোরেথিস্টেরনের সহ-উদ্ভাবক। লুইস মিরামন্টেসের বৈজ্ঞানিক অবদান বিস্তৃত, যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রকাশনা এবং জৈব রসায়ন, ফার্মাসিউটিক্যাল রসায়ন, পেট্রোকেমিস্ট্রি এবং বায়ুমণ্ডলীয় রসায়ন এবং দূষণকারী এজেন্টের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় 40টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেটেন্ট। 1951 সালের 15 অক্টোবর কার্ল জেরাসির তত্ত্বাবধানে এবং জর্জ রোজেনক্রাঞ্জের নির্দেশনায়, মেক্সিকো সিটির সিনটেক্স পরীক্ষাগারে মিরামন্টেস প্রথম মৌখিক গর্ভনিরোধক প্রোজেস্টিন নোরেথিস্টেরনের সংশ্লেষণ সম্পন্ন করেন। জেরাসির ভাষায়, "... তরুণ মেক্সিকান রসায়নবিদ লুইস মিরামন্টেস 19-নর-17α-ইথিনাইলটেস্টোস্টেরন বা সংক্ষেপে 'নোরেথিস্টেরন'-এর সংশ্লেষণ সম্পন্ন করেন—যা সংশ্লেষিত প্রথম মৌখিক গর্ভনিরোধক।" সংশ্লেষণ পদ্ধতির শেষ ধাপটি মিরামন্টেসের ব্যক্তিগত পরীক্ষাগার নোটবুকের (স্বাক্ষরিত) 114 পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত ছিল। তিনি UNAM-এর রসায়ন অনুষদের অধ্যাপক, Universidad Iberoamericana-এর রসায়ন স্কুলের পরিচালক ও অধ্যাপক এবং মেক্সিকান ইনস্টিটিউট অফ পেট্রোলিয়াম (IMP) এর গবেষণার সহ-পরিচালক ছিলেন। মিরামন্টেস আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি (Emeritus), মেক্সিকান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স, কেমিক্যাল সোসাইটি অফ মেক্সিকো, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এবং নিউ ইয়র্ক একাডেমি অফ সায়েন্সেসেরও সদস্য মনোনীত হন। ●

পিটার জোসেফ উইলিয়াম ডেবাই

পিটার জোসেফ উইলিয়াম ডেবাই 1884 সালের 24শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ডাচ-আমেরিকান পদার্থবিদ এবং ভৌত রসায়নবিদ। ডাইপোল মোমেন্ট এবং গ্যাসে এক্স-রে এবং ইলেকট্রনের বিবর্তনের সাথে আণবিক গঠনের সম্পর্ক বিষয়ক অবদানের জন্য 1936 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তার প্রথম প্রধান বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল 1912 সালে অসমমিত অণুতে আধান বন্টনে ডাইপোল মোমেন্টের ধারণার প্রয়োগ, তাপমাত্রা এবং ডাইইলেক্ট্রিক ধ্রুবকের সাথে ডাইপোল মোমেন্ট সম্পর্কিত সমীকরণ তৈরি করা। আণবিক ডাইপোল মোমেন্টের এককগুলিকে তার সম্মানে ডেবাই বলা হয়। এছাড়াও 1912 সালে তিনি নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি ফোননের অবদান অন্তর্ভুক্ত করে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নির্দিষ্ট তাপের তত্ত্বকে নিম্ন তাপমাত্রায় প্রসারিত করেন। 1913 সালে তিনি নীলস বোহরের পারমাণবিক গঠনের তত্ত্বকে প্রসারিত করেন, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ প্রবর্তন করেন। এই ধারণাটি আর্নল্ড সোমারফেল্ডও প্রবর্তন করেছিলেন। 1914–15 সালে, ডেবাই পল শেরারের ("ডেবাই-ওয়ালার ফ্যাক্টর") সাহায্যে স্ফটিকের কঠিন পদার্থের এক্স-রে বিবর্তন ধরণে তাপমাত্রার প্রভাব গণনা করেন। 1923 সালে তার সহকারী এরিখ হাকেলের সাথে তিনি সোভান্তে আরহেনিয়াসের ইলেক্ট্রোলাইট দ্রবণে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন। যদিও 1926 সালে লার্স ওনসাগার ডেবাই-হাকেল সমীকরণে উন্নতি সাধন করেন, তবুও তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটিকে এখনও একটি বড় অগ্রগতির পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও 1923 সালে ডেবাই কম্পটন প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য একটি তত্ত্ব তৈরি করেন, যা হল ইলেকট্রনের সাথে এক্স-রে মিথস্ক্রিয়া করার সময় এর কম্পাঙ্কের পরিবর্তন। ●

রঙ্গস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ কাশ্যপ

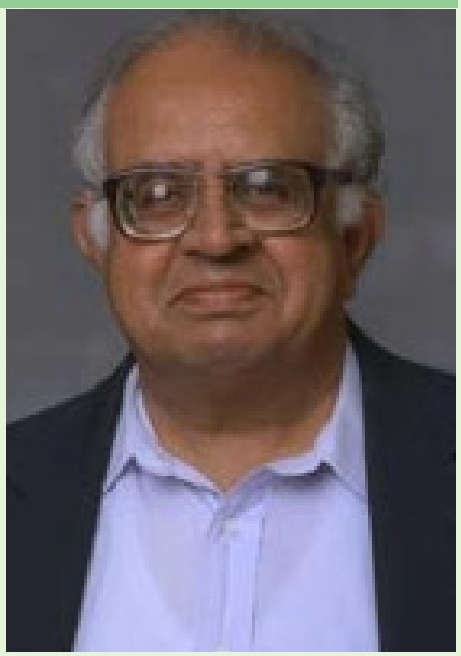

রঙ্গস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ কাশ্যপ 1938 সালের 28 মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় ফলিত গণিতবিদ এবং পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক। তিনি হার্ভার্ডের অধ্যাপক ইউ-চি হো-এর সাথে যৌথভাবে হো-কাশ্যপ নিয়ম তৈরি করেছিলেন, যা প্যাটার্ন স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল (অ্যালগরিদম) ছিল। 1982 সালে তিনি বিভিন্ন সংখ্যক অজানা পরামিতি সহ গাণিতিক প্রার্থী মডেলের একটি সেট থেকে সেরা মডেল নির্বাচন করার জন্য কাশ্যপ তথ্য মানদণ্ড (KIC) উপস্থাপন করেছিলেন। এই পরামিতিগুলি মডেলগুলিকে ডেটা (পর্যবেক্ষণ) এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সমন্বয় করা হয় যার প্রবণতা এবং পরিমাপিত মানগুলিতে পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন রয়েছে। অধ্যাপক কাশ্যপ শ্রী অরবিন্দ কাপালি শাস্ত্রী ইনস্টিটিউট অফ বৈদিক কালচারের পরিচালকও ছিলেন। পারডুতে থাকাকালীন তিনি বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে 200 টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 200 টিরও বেশি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি মূল বক্তৃতাও রয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্যাটার্ন রিকগনিশন এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার্সের একজন ফেলো ছিলেন। বৈদিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত চারটি প্রধান গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতা, কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা, এবং সামবেদ এবং অথর্ববেদ এবং প্রাচীন শ্লোকের সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন যার মধ্যে প্রায় 25000 ছন্দবদ্ধ শ্লোক রয়েছে (ধ্রুপদী সংস্কৃত থেকে আলাদা)। কাশ্যপ হলেন বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি যিনি 4টি বেদ অনুবাদ করেছেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ, 2021 সালে ভারত সরকার তাঁকে সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেছে। প্যাটার্ন স্বীকৃতিতে মৌলিক অবদানের জন্য অধ্যাপক কাশ্যপ 1990 সালে আইএপিআর কিং-সান ফু পুরস্কার পেয়েছিলেন। 2012 সালে কর্ণাটক সরকার তাকে রাজ্যোৎসব প্রশস্তি পুরস্কারে ভূষিত করে।

স্যার জন রবার্ট ভেন

স্যার জন রবার্ট ভেনের জন্ম 1927 সালের 29 মার্চ। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ফার্মাকোলজিস্ট যিনি অ্যাসপিরিন কীভাবে ব্যথা-উপশম এবং প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব তৈরি করে তা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর কাজ হৃদরোগ ও রক্তনালীর রোগের জন্য নতুন চিকিৎসা এবং এসিই ইনহিবিটর প্রবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছিল। "প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এবং সম্পর্কিত জৈবিকভাবে সক্রিয় পদার্থ সম্পর্কে তাদের আবিষ্কারের জন্য" তিনি 1982 সালে সুনে বার্গস্ট্রোম এবং বেংট স্যামুয়েলসনের সাথে যৌথভাবে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডিফিল ডিগ্রি অর্জনের পর ভেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন এবং 1955 সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বেসিক মেডিকেল সায়েন্সেস-এ সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদানের জন্য যুক্তরাজ্যে ফিরে আসেন। 1973 সালে ভেন রয়েল কলেজ অফ সার্জনস-এ তার একাডেমিক পদ ছেড়ে ওয়েলকাম ফাউন্ডেশনে গবেষণা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেখানে তার বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে সাথে নিয়ে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন গবেষণা বিভাগ গঠন করেন। সালভাদর মনকাডার নেতৃত্বে এই দলটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়ে যায় যা অবশেষে প্রোস্টাসাইক্লিন আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে। 1974 সালে ভেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 1977 সালে জাগিলোনিয়ান ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজ, 1978 সালে প্যারিস ডেসকার্টেস বিশ্ববিদ্যালয়, 1980 সালে মাউন্ট সিনাই স্কুল অফ মেডিসিন, 1983 সালে অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং 2011 সালে ফু জেন ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। প্রোস্টাসাইক্লিন আবিষ্কারের জন্য তাকে 1977 সালে লাস্কার পুরস্কার এবং বিজ্ঞানে অবদানের জন্য 1984 সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 2000 সালে ভেন আমেরিকান একাডেমি অফ অ্যাচিভমেন্টের গোল্ডেন প্লেট পুরস্কার লাভ করেন।

BroadMind

STUDY ABROAD

100% FREE Services

APPLY NOW

Why BroadMind?

- Study in World Top Univ.
- Scholarship upto 50%
- Earn in Lacs while Study
- Post Study Work Visa in abroad for IELTS /TOEFL/PTE/GRE
- Easy Permanent Residency
- Fly with Family-Spouse Workvisa

18+ years of Experience

1 Lakh Courses

Certified Professionals

1000+ Univ.

TEST PREPARATION

15+Courses

STUDY ABROAD

30+Countries

EDUCATION LOAN

18+Banks

BroadMind

1/1, Arcot Road, Vadapalani
Chennai - 600026

7603 800 800

www.broadmindgroup.com

135/3, Melur Main Rd,
Mattuthavani,
Madurai - 625007

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh.shantifoundation@gmail.com। প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।